# UTTAR-PURBA BHARAT ABONG BISHES GURUTWA SAHO TRIPURER BANGLA SAHITYA

**MA [Bengali]**

**BNGL - 903C**

**Third Semester**

**Directorate of Distance Education**

**TRIPURA UNIVERSITY**

## Reviewer

**Nirmal Das**

Professor of Tripura University

**Author:** Rintu Das

Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

# সিলেবাস বই-ম্যাপিং টেবিল

| সিলেবাস | বই ম্যাপিং |
|---|---|
| **প্রথম একক ঃ ক) প্রদ্যোত চক্রবর্তীর নাটক ঃ 'গুণধরের অসুখ'**<br>নাট্যকারের কথা, কাহিনি,<br>গুণধর ঃ অসুস্থ বিশ্বে বিবেকের সন্ধান, বর্তমান সমাজে 'গুণধরের অসুখ'-এর প্রাসঙ্গিকতা,<br>সংগীতের ব্যবহার, গুণধরের অসুখ ঃ বিষণ্ন-মধুর চরিত্রের ছটায় উদ্ভাসিত মঞ্চ<br>মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যচিন্তা এবং গণধরদের সুখ-অসুখ।<br><br>**খ) উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতা ঃ**<br>হেমাঙ্গ বিশ্বাস, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, অশোকবিজয় রাহা, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী,<br>'উনিশে মে ও আমি', অমিতাভ দেব চৌধুরী, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য। | একক - ১<br>(পৃষ্ঠা ১-৩৮) |
| **দ্বিতীয় একক ঃ উত্তর-পূর্বের প্রবন্ধ**<br>দেশভাগের অলিখিত উপন্যাস, চর্যাপদ, কৃষ্ণকথা ও মঙ্গলকাব্য ঃ অনালোকিত প্রেক্ষিত<br>পুরাণের পুনর্জন্ম ও রবীন্দ্রনাথ, 'রবি পত্রিকা ঃ ভাবের ঝুলি ঃ রবীন্দ্র রচনা ও পাঠান্তর<br>ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাসে কিছু দৃষ্টিপাত। | একক - ২<br>(পৃষ্ঠা ৩৯-৫০) |
| **তৃতীয় একক ঃ নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্তের 'জীবনের মানে'**<br>নাট্যকার পরিচিতি, নাটক সম্পর্কিত কিছু তথ্য ঃ ত্রুটি ও সংশোধন<br>কাহিনী বিন্যাস, রেবা - নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র, নামকরণ। | একক - ৩<br>(পৃষ্ঠা ৫১-৫৮) |
| **চতুর্থ একক ঃ বীরেন দত্তের উপন্যাস 'গ্রামের মেয়ে'**<br>বীরেন দত্তের জীবনবৃত্তান্ত ও সমকাল,<br>কাহিনি বিন্যাস, চরিত্র বিচার। | একক - ৪<br>(পৃষ্ঠা ৫৯-৭৮) |

# সূচীপত্র

টিপ্পনী

**প্রথম একক ঃ ক) প্রদ্যোত চক্রবর্তীর নাটক ঃ 'গুণধরের অসুখ' (পৃষ্ঠা ১-৩৮)**

- নাট্যকারের কথা
- কাহিনি
- গুণধর ঃ অসুস্থ বিশ্বে বিবেকের সন্ধান
- বর্তমান সমাজে 'গুণধরের অসুখ'-এর প্রাসঙ্গিকতা
- সংগীতের ব্যবহার
- গুণধরের অসুখ ঃ বিষণ্ন-মধুর চরিত্রের ছটায় উদ্ভাসিত মঞ্চ
- মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যচিন্তা এবং গণধরদের সুখ-অসুখ

**খ) উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতা ঃ**

- হেমাঙ্গ বিশ্বাস
- রামেন্দ্র দেশমুখ্য
- অশোকবিজয় রাহা
- শক্তিপদ ব্রহ্মচারী
- 'উনিশে মে ও আমি'
- অমিতাভ দেব চৌধুরী
- বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

**দ্বিতীয় একক ঃ উত্তর-পূর্বের প্রবন্ধ (পৃষ্ঠা ৩৯-৫০)**

- দেশভাগের অলিখিত উপন্যাস
- চর্যাপদ, কৃষ্ণকথা ও মঙ্গলকাব্য ঃ অনালোকিত প্রেক্ষিত
- পুরাণের পুনর্জন্ম ও রবীন্দ্রনাথ
- 'রবি পত্রিকা ঃ ভাবের ঝুলি ঃ রবীন্দ্র রচনা ও পাঠান্তর
- ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাসে কিছু দৃষ্টিপাত

টিপ্পনী

**তৃতীয় একক ঃ নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্তের 'জীবনের মানে'** **(পৃষ্ঠা ৫১ –৫৮)**

- নাট্যকার পরিচিতি
- নাটক সম্পর্কিত কিছু তথ্য ঃ ত্রুটি ও সংশোধন
- কাহিনী বিন্যাস
- রেবা – নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র
- নামকরণ

**চতুর্থ একক ঃ বীরেন দত্তের উপন্যাস 'গ্রামের মেয়ে'** **(পৃষ্ঠা ৫৯–৭৮)**

- বীরেন দত্তের জীবনবৃত্তান্ত ও সমকাল
- কাহিনি বিন্যাস
- চরিত্র বিচার

# ভূমিকা

টিপ্পনী

বৃহৎ বঙ্গদেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার যে ধারা একসময় ছিল তা বর্তমানে অনেকাংশে বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়েছে। দেশ বিভাজনের ফলে পূর্ববঙ্গ আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ভাষাকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। একদিকে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ অন্যদিকে স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত থাকে। যদিও দুই দেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ বহুলাংশে সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। যার ফলে দুই দেশের সাহিত্য একই ভাষায় রচিত হলেও আঞ্চলিক প্রভাব পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। তবে শুধুমাত্র বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, বহির্বঙ্গেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। বহির্বঙ্গে যে সমস্ত অঞ্চলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা অধিক বিস্তার লাভ করেছে তার মধ্যে অন্যতম উত্তর-পূর্ব ভারত বিশেষ করে ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় প্রভৃতি অঞ্চল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু বাঙালি এই সমস্ত অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আর বাংলাদেশে ফিরে যান নি। উত্তর-পূর্ব ভারতে নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের ফলে এই সমস্ত অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানুষেরা বাঙালিদের উৎঘাত করতে চেয়েছিল যার ফলে 'বঙালখেদা আন্দোলনে'র সৃষ্টি হয়েছিল। সামাজিক এই সংকটের মুখে দাঁড়িয়েও বাঙালিরা কোথাও পালিয়ে যান নি। উত্তর-পূর্ব ভারতে ভাষার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও আলাদা রাজ্যের দাবী জানান নি। এই অঞ্চলে থেকেই সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস করেছেন। সাহিত্য চর্চা ও প্রকাশন অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব সত্ত্বেও নিজেদের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে সাহিত্য চর্চার ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। ত্রিপুরা, শিলং, আসামের বরাক প্রভৃতি অঞ্চলে কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ চর্চা বর্তমানে অত্যন্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এই সমৃদ্ধি কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের নয়। স্থানিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ করলেও এখানকার বাংলা সাহিত্যের চর্চা মূল বাংলা সাহিত্যের ধারাকেই সমৃদ্ধ করছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও উপন্যাসের যে চর্চা অব্যাহত আছে সেখান থেকে নির্বাচিত অংশ বিশেষ আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে।

# প্রথম একক

## ক) প্রদ্যোত চক্রবর্তীর নাটক ঃ ‘গুণধরের অসুখ’

প্রদ্যোত চক্রবর্তীর ‘গুণধরের অসুখ’ নাটকটি ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সালে গুয়াহাটির ‘বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজ’ থেকে প্রথম গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়। তবে নাটকটি রচনা হয়েছিল এর অনেক আগে। নাটকটি আনন্দধারা সাংস্কৃতিক সংঘের পরিবেশনায় গুয়াহাটির সেন্ট্রাল পাণ্ডুর রেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউটে ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ সালে প্রথম অভিনিত হয়েছিল ‘গুণধরের অসুখ’ নাটকটি রচনার নেপথ্যে যে ঘটনার অভিঘাত নাট্যকারকে প্রভাবিত করেছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন স্বয়ং প্রদ্যোত চক্রবর্তী ‘নাট্যকারের কথা’ অংশে। এছাড়াও নাটকটির অভিনয় সংক্রান্ত অনেক কথা আমাদের জানিয়েছেন নাট্যকার। এখানে নাট্যকারের সেই কথাগুলো উপস্থাপন করা যেতে পারে -

টিপ্পনী

### নাট্যকারের কথা ঃ

আমার লেখা নাটকগুলি, নাটকের বিভিন্ন চরিত্র, নাট্যমুহূর্ত ইত্যাদির উৎসগুলিকে অধিকাংশ সময়েই স্পষ্টভাবে খুঁজে পাই না। ‘গুণধরের অসুখ’ নাটকের ভাবনাটার সূত্রপাত মনে আছে। মালিগাঁও থেকে গুয়াহাটি যাচ্ছিলাম সিটি বাসে। আমার পাশের সিটটাতে একজন দুস্থ বিধবা ভদ্রমহিলা। তাঁর ডান হাতটা সামনের সিটের লোহার রডটার ওপর। দু-আঙুলে একটা বাসের টিকিট ধরে রেখেছেন তিনি, বড়ো স্পষ্টভাবে। একটা খাঁটি টিকিট ওরকম প্রকটভাবে প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় না। তাঁর শক্ত হয়ে বসে থাকার ভঙ্গিটায় সহজেই বোঝা যায় যে তিনি লোক ঠকানোয় অভ্যস্থ নন। আমি লক্ষ্য করেছি, বাসযাত্রী উচ্চবিত্তের মানুষ না হলে বাস কন্‌ডাক্‌টাররা ফাঁকিবাজকে রেয়াৎ করেন না। স্বাভাবিক হিসেবেই কন্‌ডাক্‌টার অনেককে ডিঙিয়ে ভদ্রমহিলার কাছে ভাড়া চাইলেন আর ভদ্রমহিলার হাতের টিকিটটা ফেলে দিয়ে ছোট্ট মলিন পার্স থেকে পঞ্চাশ পয়সার একটা কয়েন বার করলেন। বড়ো স্পষ্টভাবে অনুভব করলাম, পঞ্চাশটা পয়সার মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশি। ইচ্ছে হলো, তাঁর ভাড়াটা আমি মিটিয়ে দিই। দিলাম না, শুধু ভাবলাম। আমার ভাবনাটা তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না, তাই ভাবনায় সমস্যা নেই। কিন্তু সভ্য সমাজের একজন স্বাভাবিক নাগরিক হিসেবে আমার আচরণ এক লক্ষণরেখায় সীমাবদ্ধ। একজন অনাত্মীয়ার দিকে উপযাচক হয়ে সাহায্যের হাত বাড়াতে পারি না আমি। আমার এই চেষ্টায় ভদ্রমহিলার আত্মসম্মান আহত হলে অপমানিত-অপ্রস্তুত হবার সম্ভাবনা। আচ্ছা, আমি মনে মনে ভাবলাম, ভদ্রমহিলা দেখতে আমার মা-র মতো - এই মিথ্যের সাহায্য নিয়ে কি আমি তাঁর হাত ধরার অধিকার পেতে পারি না? ভাবনাটাকে পুরোপুরি মিথ্যেই বা বলি কী করে? খুঁজে দেখলে কিছু মিল তো পাওয়া যাবেই। তবুও প্রশ্ন, কোনো ছিটগ্রস্থ মানুষ ছাড়া অন্য কারোর এধরণের আচরণ কতখানি গ্রহণযোগ্য? আমার সমস্যার সমাধানে গুণধরের আবির্ভাব যে কাজ আমি করতে পারি না, অবলীলায় সে কাজ করে বসে সে।

নাট্যচর্চা সমেত আমার সমস্ত কর্মকাণ্ডে অনুজ অচ্যুৎ ছিল আমার সঙ্গী। আমি লেখালেখি

টিপ্পনী

করি, অচ্যুৎ-এর অভিনয় নেশা। নিজেদের দল ছিল না। একটা নাটক লিখে শেষ করার পর এখান-সেখান থেকে অভিনেতা জোগাড় করে রিহার্সাল শুরু হতো। তারপর নতুন এক সংস্থা তৈরি করে, বা অন্য কোনো সংস্থার হয়ে নাট্যাভিনয় করতে হতো। 'গুণধরের অসুখ'-এর আগে আরেকটা নাটক লিখেছিলাম দীর্ঘ প্রচেষ্টায় যে নাটক মঞ্চস্থ করা যায়নি প্রধানত নাটকের চরিত্রলিপিটি দীর্ঘ হওয়ায়। সে নাটকের নাম ছিল 'এখানে জীবন'। পরবর্তী সময়ে একই নামে অন্য এক নাট্যকারের অন্য একটি নাটক কলকাতায় মঞ্চস্থ হবার খবর পেয়েছি। আমার 'এখানে জীবন'-এর পরিবর্তিত রূপ 'ধারাবাহিক'। শিলিগুড়ির 'উত্তাল' নাট্যগোষ্ঠী কয়েকটি অভিনয় করার পর বর্তমানে কলতকাতার 'সৃষ্টিসুখ'-এ নাটক নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ করে চলেছে। 'এখানে জীবন' মঞ্চায়নের অসফল প্রয়াস 'গুণধরের অসুখ'কে অপেক্ষাকৃত কম চরিত্রে সীমাবদ্ধ রাখতে প্ররোচিত করেছিল। প্রথমটিতে চরিত্র সংখ্যা নয়, তিনটি নারীচরিত্র সমেত। দ্বিতীয়টি নারী-বর্জিত ছ'চরিত্রের নাটক। স্থানীয় একটি সংস্থার দ্বারস্থ হওয়া গেল। রিহার্সাল রুমে আবার আলো জ্বলবে সে সম্ভাবনায় সম্মত হলেন কর্মকর্তারা। দিন চারেক রিহার্সাল হবার পর 'গুণধরের অসুখ' বাতিল করে তাঁরা একটি বিপ্লবাত্মক নাটক ধরলেন। আবার আমরা বিচ্ছিন্ন। এবার দলে তিনজন। অচ্যুৎ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিনেতা প্রতীপ ঘটক। অভিনেতার সংখ্যা কমিয়ে নাটকটাকে নতুন করে লেখার প্রয়োজন হলো। চারজনের চেয়ে কমানো গেল না সংখ্যাটা। স্থানীয় রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের হয়ে নাটক করার সিদ্ধান্তে রিহার্সালের ঘর ও মাসুল-মুক্ত প্রেক্ষাগৃহের ব্যবস্থা হলো। অনুজ-প্রতিম প্রয়াত সুভাষ দে ও শান্তনু রায়চৌধুরী তাঁদের সংস্থা আনন্দধারা সাংস্কৃতিক সংঘের সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে এগিয়ে এলে ১৯৯১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধেয় নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন সব দিক থেকে সফল হয়। অধুনালুপ্ত সংবাদপত্র 'সময় প্রবাহ'র সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সুকুমার বাগচি ও আমার অনুজ প্রতিম সাংবাদিক বন্ধু উদয়ন বিশ্বাস উদ্যোগী হয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে 'গুণধরের অসুখ' ও তার প্রথম মঞ্চায়ন নিয়ে তাঁদের কাগজে দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনা ছেপেছিলেন। এর ফলে অসমের বিভিন্ন প্রান্তে ও অসমের বাইরে কিছু জায়গায় নাটকটি নিয়ে ঔৎসুক্য দেখা দেয় এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসে 'প্রাঙ্মুখ' নামে একটি সংস্থা ছিল আমাদের শহরে, কর্মকাণ্ডে স্তিমিত। কিন্তু তহবিল ছশো টাকা। 'প্রাঙ্মুখ'-এর পক্ষ থেকে নাটক করার সিদ্ধান্ত হলো। এই পর্বে নাটকটির ছ-সাতটি অভিনয় হয়েছিল। অসম, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জায়গা কলকাতার মুক্তাঙ্গন ছাড়াও বিশ্বভারতী ছাত্র সংসদ-এর আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনের নাট্যঘরে একটি অভিনয় হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। 'সময় প্রবাহ' কাগজটির প্রথম ও একমাত্র শারদীয় সংখ্যায় নাটকটির প্রথম প্রকাশ ১৯৯২ সালে প্রয়াত কবি বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের উৎসাহে এ নাটক পৌঁছোয় নাট্যকার শ্রদ্ধেয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের হাতে, এবং শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে কলকাতার বিশিষ্ট নাট্য-নির্দেশক-অভিনেতা এবং 'সংস্তব'-এর কর্ণধার দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। 'সংস্তব'-এর প্রযোজনায় কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়, দিল্লি, মুম্বাই সহ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য স্থানে এ পর্যন্ত এ নাটকের একশো আশিটির বেশি অভিনয় হয়েছে। বিদগ্ধজনদের সপ্রশংস আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার 'সংস্তব'-এর প্রযোজনার দৌলতে থিয়েটার ওয়ার্কশপ-প্রদত্ত ২০০১ সালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান সত্যেন মিত্র পুরস্কার লাভ। নাট্যকার রূপে পরিচিত হয়ে ওঠার জন্য উল্লেখিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছে আমি ঋণী। পরিবারের প্রশ্রয় না থাকলে অনেক আগেই দুই ভাইয়ের নাট্যচর্চায় যবনিকা পড়ত। কবি বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের পুত্র শ্রীমান টুটুল মানসিকভাবে সাধারণ পাঁচজনের চেয়ে আলাদা। তার বাচনভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে

গুণধর চরিত্রে। নাটক রচনার সময় আমার কন্যা নেহাৎই শিশু। তারও কিছু সংলাপ গুণধরের মুখে পুনরুচ্চারিত।

নাটকটা যথেষ্ট গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে বই আকারে প্রকাশ করতে উদ্যোগ নিয়েছেন শ্রদ্ধেয় উষারঞ্জন ভট্টাচার্য অনুজ-প্রতিম প্রসূন বর্মন সহ বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজ গুয়াহাটির অন্যান্য সদস্যরা। তাঁদের আগ্রহ ও উদ্যোগ আমাকে অভিভূত করেছে। শ্রদ্ধেয় অরুণকুমার বসুর লেখা মুখবন্ধ আমার সৃষ্টিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

টিপ্পনী

## কাহিনি ঃ

গুয়াহাটি বড়োবাজারের ভ্যারাইটি স্টোর্সের মালিক ধনঞ্জয় চৌধুরী। তিনি হাইপ্রেসারের রোগে ভুগছিলেন। স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়েই তাঁর সংসার। তাঁর ছেলে তিরিশ বছরের যুবক - নাম গুণধর। গুণধরকে নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত। কারণ গুণধর সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে না। গুণধরের কথা বলা, চিন্তাভাবনা সকলের থেকে আলাদা আর তাই সকলের কাছে সে পাগল-হাবা বলেই পরিচিত। গুণধরের মা-ও ছেলেকে নিয়ে সবসময় দুশ্চিন্তা করেন, মনে মনে কষ্ট পান। তিরিশ বছর বয়স হলেও তিন বছরের ছেলের মতো কণ্ঠস্বর গুণধরের। যদিও তার অনেক আচরণ ও চিন্তাভাবনা নিতান্ত শিশু সুলভ নয় - বরং অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের সাধারণ চিন্তাভাবনাকে ছাড়িয়ে যায়। আর সেই অসাধারণত্বই হচ্ছে গুণধরের অসুখ।

গুণধর অন্যের হাসিতে আনন্দ পায়, অন্যের কষ্টে সমব্যথী হয়। তার মনে প্রশ্ন দেখা দেয় 'দুঃখ ভালো না আনন্দ'? সে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। ক্লাস টেনের শেষ পরীক্ষাটা সে দিতে পারে নি। কারণ রাস্তায় পাঁচ পাওয়ালা গরু দেখতে গিয়ে পরীক্ষা-হলে যেতে দেরী করেছিল সে। গোপাল মাস্টার তাকে পরীক্ষা দিতে দেন নি। গোপাল মাস্টার সবাইকে হাসান- এটা গুণধরের ভালো লাগে। গোপাল মাস্টারের ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে - আর খোঁজ পাওয়া যায় নি। তাই গোপাল মাস্টারের খুব দুঃখ। এই দুঃখে গুণধরও কষ্ট পায়। গুণধর বাড়িতে বসে থাকতে ভালোবাসে না। সে সবাইকে হাসাতে ও আনন্দ দিতে ভালোবাসে - সে জন্য সে গাধা সাজতেও রাজি। আর তাই পাড়ার ছেলেরা তার পিঠে 'গাধা' লেখা কাগজ লাগিয়ে দিলে সে নেচে নেচে সবাইকে আনন্দ দেয় এবং সারা পাড়া ঘুরতে থাকে। গুণধরের মা ছেলের এই সব কান্ড কারখানায় মনে মনে কষ্ট পান আর অশ্রুসিক্ত চোখে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। গুণধর কিন্তু মায়ের এই হাঁড়িপনা মুখ একেবারেই পছন্দ করে না আর তাই সে বলে - "যার মুখটা হাঁড়ি, তার সঙ্গে আড়ি।" মায়ের দু-একটা কাজও গুণধর করে দেয়। যেমন - পাকা চুল বেছে দেওয়া, চালকুমড়ো দুই ভাগ করে দেওয়া ইত্যাদি।

গুণধর তার বাবার ভ্যারাইটি স্টোর্সে মাঝে মাঝে বসে। সেখানেই একদিন তার দেখাহয় উজ্জ্বল রায়ের সঙ্গে। উজ্জ্বল রায় একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের চাকরি করে। সে এসেছে গুণধরের দোকানে ফোন করতে। ফোনে সে ছন্দা নামে এক মেয়ের সঙ্গে কথা বলে। গুণধর কিন্তু অপরিচিত ছন্দা সম্পর্কে অনেক তথ্যই বলে দেয় উজ্জ্বলকে। ছন্দার বয়স কত, ছন্দার গায়ের রং কেমন, কেমন শাড়ি পরে, এমনকি ইমিটেশনের হিরের নাকচাবি হারিয়ে গেলে ছন্দার যে খুব কষ্ট হয়, তাও সে উপলব্ধি করে। ছন্দা উজ্জ্বলের বন্ধু

পবিত্রর বাগ্‌দত্তা। ছন্দা, পবিত্র, উজ্জ্বল একসঙ্গে কলেজে পড়েছে। পবিত্র ও ছন্দা পরস্পরকে ভালোবাসে। দীর্ঘদিন উজ্জ্বলের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই। ছন্দার কাছ থেকে উজ্জ্বল জানতে পারে পবিত্রর সঙ্গে তার এখনও বিয়ে হয়নি। উজ্জ্বল গুণধরের মুখে ছন্দার বর্ণনা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে সে ছন্দাকে চেনে কিনা। গুণধর বলে – 'মনে হয়, যেন চিনি।'

টিপ্পনী

ধনঞ্জয় বাবু গুণধরকে পাওয়া টাকা আদায়ের জন্য চক্রবর্তীবাবুর কাছে পাঠালে সে সেখানে গিয়ে চক্রবর্তীবাবুর ছোটো নাতনির সঙ্গে লুডো খেলতে বসে যায়। চক্রবর্তীবাবুর কাছে সে টাকা চাইতে পারে না। কারণ টাকা চাইলেই তার হাসি বন্ধ হয়ে যাবে। আর অন্যের হাসিতেই গুণধরের আনন্দ। শুধু তাই নয়, চক্রবর্তীবাবুর মন খারাপ ঠিক করতে সে কাগজের লেজ পড়ে তাকে হাসায়। গুণধরের কাছে টাকা ও কাগজের কোনো পার্থক্য নেই। আর তাই তার বাবা তারই মতো দেখতে একটি ছেলেকে এক টাকা দিলে, সে টাকার বদলে নৌকা বানানোর জন্য খাতা থেকে একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে দিতে বলে।

এদিকে উজ্জ্বল ম্যানেজার হয়ে গেছে – এই খবর ছন্দাকে দেবার জন্য গুণধরের দোকানে এসেছে ফোন করতে। উজ্জ্বলে চোখ, গায়ের জামা, হেলমেট দেখেই গুণধর বুঝে গেছে যে, উজ্জ্বলের প্রমোশন হয়েছে। ছন্দাকে ফোন করে উজ্জ্বল তার ম্যানেজার হওয়ার খবর জানায়। এরপর ছন্দার কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে পবিত্রকে ফোন করে। উজ্জ্বল পবিত্রর সঙ্গে ফোনে কথা বললেও গুণধর দূর থেকেই পবিত্রর কষ্টের কথা জেনে যায়। পবিত্র উজ্জ্বলকে জানায় তার মা অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য সাতশো টাকা দরকার – তাই সখের হারমনিয়ামটা সে বেঁচে দিবে। উজ্জ্বল কিন্তু পবিত্রকে হারমোনিয়াম বেচতে দেয় না। তার মায়ের চিকিৎসার সব টাকা উজ্জ্বল দিতে রাজি হয়। এই সহমর্মিতায় মুগ্ধ হয়ে গুণধর উজ্জ্বলকে 'ভালো' বলে প্রশংসা করে। অন্যদিকে, উজ্জ্বলের বাবা কিছু টাকার জন্য উজ্জ্বলের কাছে ফোন করলে উজ্জ্বল দিতে রাজি হয় না। এমনকি তার বাবার বয়স হওয়াতে চাকরি থেকে বের করে দেবার খবর শুনেও সে বেশি টাকা দিতে অস্বীকার করে। গুণধর কিন্তু উজ্জ্বলের বাবার দুঃখ বুঝতে পারে আর তাই উজ্জ্বলের এই নিষ্ঠুর আচরণে সে হতাশ হয়। উজ্জ্বলের বাবার কাটা দাগের কথা গুণধর বলে দেয়। এমনকি উজ্জ্বল বি.এ. তে যে নম্বর পেয়েছিল এবং তার জন্য তার বাবা যে হাতঘরি দিয়েছিল সে কথাও গুণধর জানিয়ে দেয়।

গুণধরের পাগলামোতে অতিষ্ঠ হয়ে ধনঞ্জয়বাবু তাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যান। তবে সেখানে গিয়ে গুণধরের আচরণে স্বয়ং ডাক্তার হতবাক হয়ে যান। গুণধর ডাক্তারের কষ্টের কথা, রাত্রে ঘুম না হওয়ার কথা বললে ডাক্তার বুঝতে পারেন গুণধর তথাকথিত অর্থে পাগল নয়। আর তাই গুণধরকে কোনো ওষুধ না দিয়ে বরং নিজে কীভাবে রাতে ঘুমোতে পারবে সে ব্যাপারে করণীয় কর্তব্য জেনে নেন গুণধরের কাছ থেকে। গুণধর শুধু ডাক্তারের নয়, তার পাড়া-প্রতিবেশী – হারুর ঠাকুমার ব্যাথা, কল্পনাদিদির দুঃখ এসবেও ব্যথিত হয়। ভূমিকম্প হলে গুণধর আনন্দ পায়। কারণ ভূমিকম্পে বাড়িঘর ভেঙে গেলে সকলে মিলে একসঙ্গে থাকা যাবে। গুণধর দোকানে বসে ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ লোকই গুণধরকে ঠকিয়ে যায় একদিন এক বৃদ্ধা একটি নকল এক টাকার কয়েনের বিনিময়ে তার কাছ থেকে দুটো আধুলি নিয়ে চলে যান। সেই ভদ্রমহিলাকে দেখে গুণধরের তার মায়ের মতো মনে হয়। বাবার ওষুধ নিয়ে ভদ্রমহিলাকে দিয়ে দেয় সে। গুণধর ভদ্রমহিলার এই প্রয়োজনের কথা আগে থেকেই জেনে যায়। বাবা ছেলের এই নির্বুদ্ধিতায় দুঃখ পেয়ে তার আর বুদ্ধি-সুদ্ধি হবে কিনা জিজ্ঞেস করলে, সে জানায় – 'বুদ্ধি

ভালো না বাবা'। এদিকে উজ্জ্বলের বাবা উজ্জ্বলের খোঁজে গুণধরের দোকানে এসেছিলেন। গুণধর তাঁর জলের বোতল ভরে দিলে তিনি গুণধরকে তাঁর হাতঘরিটা দিয়ে দেন। পবিত্র আর্থিক দূরবস্থার জন্য ছন্দাকে বিয়ে করতে না পারার সুযোগটাকে কাজে লাগায় উজ্জ্বল পবিত্রকে সরাসরি জানিয়ে দেয় - সে-ই ছন্দাকে বিয়ে করবে। গুণধর ফোনে পবিত্রর সঙ্গে কথা বলে। উজ্জ্বলকে স্কুলে পড়ার সময় তারই সমবয়সী একটি ছেলে নদীতে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিল। গুণধর সে কথা পবিত্রর মাধ্যমে জানায়। পবিত্রকে গুণধর সাহায্য করতে চায়।

টিপ্পনী

উজ্জ্বল ছন্দাকে যে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল - সে ব্যাপারে ছন্দার মত জানতে চাইলে ছন্দার চোখে জল এসে যায়। উজ্জ্বল এবার ছন্দাকে পাওয়ার জন্য পবিত্রকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করে। উজ্জ্বল যে টাকা দিয়ে পবিত্রকে সাহায্য করেছিল তা হঠাৎ দাবি করে বসে। পবিত্রর পক্ষে সে টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই গুণধর তার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে পবিত্রকে দিতে চায়। পবিত্রর প্রয়োজনকে তার নিজের প্রয়োজন বলে মনে হয়। এদিকে পবিত্র টাকা সংগ্রহ করে উজ্জ্বলকে দিতে চায়। ধনঞ্জয়বাবুর আপত্তি সত্ত্বেও গুণধর ক্যাশবাক্স খুলে টাকা নিতে চায়। গুণধর তার বাবার দোকানে এতদিন যে কাজ করেছে তার বিনিময়ে নিজের পাওয়া দাবি করে - যা দিয়ে সে পবিত্রকে সাহায্য করবে।

ইতিমধ্যে পবিত্রর মা মারা গেলে পবিত্র মাকে নিয়ে শ্বশানে যায়। এই খবরে উজ্জ্বল মর্মাহত হয়। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে নীচতা দেখিয়েছে, সে কারণে সে লজ্জিত, আর তাই পবিত্রর কাছে সে ক্ষমা চেয়েছে। গুণধর কিন্তু সমস্ত বাধা-বন্ধন ত্যাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায় সকলের বারণ সত্ত্বেও। বাবা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে গুণধরের মাথায় পিস্তল ধরেন। উজ্জ্বল গুণধরকে বাঁচানোর আশ্বাস দেয়। গুণধরের তার বাবাকে উন্মাদ মনে হয়, ছেলেধরা মনে হয়। সে সমস্ত জাগতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে গিয়ে সাংসারিক ক্ষুদ্র গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। তার সাংসারিক জগৎকে পরবাস বলে মনে হয়। শেষ পর্যন্ত গুণধর বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। গুণধরের মা এখনও তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। গুণধরের খোঁজ এখনও চলছে।

## গুণধর ঃ অসুস্থ বিশ্বে বিবেকের সন্ধান ঃ

'গুণধরের অসুখ' সর্বার্থেই একটি আধুনিক নাটক, অথচ তার সর্বাঙ্গে শ্লোগানের ছায়ামাত্র নেই। প্রথাবহির্ভূত বিন্যাসে একটি সাধারণ কাহিনির মধ্য দিয়ে সে আমাদের এক বিপন্ন সময়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। আমাদের মনে পড়ে যায়, 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এমন।' আমরা বুঝতে শিখি এ অসুখ আসলে আধুনিক মানুষেরই মনে, নিজেদেরই সযত্নলালিত পার্থিব খাঁচায় আমরা তার প্রাণরস জুগিয়ে চলেছি স্বার্থান্ধ অহঙ্কারে। তাকে ছুটি দেওয়ার কল্পনায় তাই শিউরে ওঠে হিসেবি মানুষ। কেননা হৃদয়ের গভীরে সে জানে এই অসুস্থ পৃথিবীতে গুণধরই দ্বন্দ্বময়তাকে চিনিয়ে দেয়, নাড়া দেয় অন্তর্নিহিত এক গোপন প্রকোষ্ঠে। আমরা গুণধরের হৃদয়কে স্পর্শ করতে চাই, তার অকৃত্রিমতাকে আয়ত্ত করেতে চাই মনে মনে - কিন্তু পারি না, আর পারি না বলেই গুণধরকে নিঃসঙ্কোচে মেনে নেওয়াও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অথচ সে না থাকলে আমাদের বিবেকও যে নিঃস্ব হয়ে যায়। এই স্বতঃবিরোধ থেকে সৃষ্টি হয় অসাধারণ নাট্যমুহূর্তের; আধুনিক কাল তখন দেশ ও পাত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না। এক রক্তক্ষরা আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে

আমরাও আঁকতে চাই বিপন্ন সময়ের ছবি – সান্ত্বনা পেতে চাই এক সম্ভাব্য উত্তরনের সন্ধানে। ফলে নাটকটির আপাত বিমূর্ত রূপ শেষ পর্যন্ত অবয়ব লাভ করে আমাদেরই চারপাশে প্রতিদিনের দেখা চরিত্রের আদলে।

এই নাটকে প্রকৃত অর্থে নিটোল ও দৃঢ় নিবদ্ধ কোনো গল্প নেই। আছে কিছু টুকরো টুকরো ঘটনা, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকেই কুড়িয়ে নেওয়া। আর ওইসব ঘটনার সংঘাতেই জমে ওঠে নাটক – এগিয়ে চলে এক অমোঘ ক্লাইম্যাক্সের দিকে, অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সে যার সমাপ্তি।

টিপ্পনী

গুণধর শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ এক যুবক। কিন্তু প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মানসিকভাবে খানিকটা অসুস্থ। পাড়ায় সে বোকা, হাবা, পাগল হিসেবে চিহ্নিত। সে খায়-দায়, বাবার দোকানে কাজ করে। যদিও তার বাবার মতে, অকাজের অংশই বেশি। আমরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করলে সে খুশি হয়, কেননা সে হাসি ভালোবাসে। পাড়ার ছেলেরা কাগজে 'গাধা' লিখে তার পিঠে লাগিয়ে দিলে সে মজা পায়, কাগজটা খুলে ফেলে না। কারণ তাতে ছেলেদের আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। এই হলো গুণধর এবং ওইসব তার অসুখের লক্ষণ। সে নিজেই জানে তার অসুখের কথা। তবুও পাগলের সংজ্ঞা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে। যেমন একদিন জনাকয়েক ছেলে একটি পাগলের গায়ের জামাটা টেনে ছিঁড়ে দিলে সে পাগলটাকে কাঁদতে দেখে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চায় যে, লোকটা যদি পাগলই হবে তবে তো তার দুঃখ পেলে হাসা উচিত। এই গুণধর নাটকের শেষে হারিয়ে যায় এবং তার সন্ধান থেকেই নাটকের শুরু। অর্থাৎ ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে নাটকটির উপস্থাপনা।

নাটকের মূল চরিত্র তিনটি – গুণধর, তার বাবা ও উজ্জ্বল নামের এখ আধুনিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক। এছাড়া রয়েছে সূত্রধার, পবিত্র, ডাক্তার ও মাস্টারমশায়। নারী চরিত্র নেই। তবে অদৃশ্য ও অশ্রুত নেপথ্যচারিণী মা ও উজ্জ্বল-পবিত্রের প্রেমিকা ছন্দার ভূমিকা এ নাটকে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মঞ্চে তাদের উপস্থিতি যেন অনুভব করা গেছে। গুণধরের বাবার দোকানে যে টেলিফোনটি রয়েছে উজ্জ্বল তা ব্যবহার করতে আসে, তাতেই নাটকে উপকাহিনির সন্ধান পাওয়া যায়। মূল চরিত্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে সেগুলি যেমন নাটককে এগিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিরও সহায়ক হয়ে ওঠে এবং সেইসঙ্গে বেরিয়ে আসে নাটকের পাত্রদের হাসি-অশ্রু, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-স্বার্থের সংঘাতময় বিবরণ। গুণধর প্রশ্ন করে – "দুঃখ ভালো, না আনন্দ?" সে জানে "বড়ো দুঃখে গাওয়া যায় না। বড়ো আনন্দে গাওয়া হয় না।" আবার নিজের বাবার সঙ্গে উজ্জ্বল দুর্ব্যবহার করলে গুণধর রেগে যায়। প্রতিবাদের মুখে স্বীকার করে তার মতো পাগলের দুঃখ দেবার লাইসেন্স নেই, আছে দুঃখ পাবার। ডাক্তারের কাছেও গুণধরের বাবা ছেলের ওই অসুখের কথা বলেন – "অন্যের দুঃখ দেখলে কষ্ট পায়।" অস্বাভাবিকতার প্রমাণ হিসেবে ডাক্তারকে বলেন – "মাঝ রাতে ঘুম ভাঙলে হয়তো আমি বা ওর মা দেখি, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।" ডাক্তারের প্রশ্নের জবাবে গুণধর জানায় – "আমি দেখি.... ছোটো ছোটো ঘর।....দুঃখ। হাসি। আলাদা। দেওয়াল দিয়ে।" হারুর ঠাকুমার ব্যাথা, কল্পনা দিদির দুঃখে তার কষ্ট হয়। সে ইচ্ছা প্রকাশ করে – "সবাইকে ঘর থেকে বার করে মাঠটা ভরে ফেলি।" অন্যদিকে ভূমিকম্পে তার আনন্দ। কারণ – "বাড়িঘরগুলো সব ভেঙে যাবে, আমরা সবাই একসঙ্গে থাকতে পারব।" গুণধরের এরকম অসংখ্য সংলাপে গুণধরের অসুখের মধ্যে আমরা এক সংবেদনশীল মানুষেরই সন্ধান পাই।



গুণধর যখন বলে, "আমি হাসি ভালোবাসি" – তার মধ্যে পাগলামির লক্ষণ দেখে সুস্থ

মস্তিষ্কের আমরা হেসে উঠি। কিন্তু তখন কি একবারও আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে না যে অন্যের সুখে সুখি হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কোথায়? হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে যে মানুষ তার প্রকৃতিস্থতাতেই বা তাহলে সন্দেহ পোষণ করা কেন? আসলে সুখ ও দুঃখের সম অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে দুঃখ থেকে পরিত্রাণে উৎসর্গীকৃত যে জীবন, গুণধর যেন তারই প্রতিভূ। তাই অন্যের কষ্ট ও যন্ত্রণাকে গুণধর নিজের হৃদয় খুঁড়ে আবিষ্কার ও অনুভব করে। উজ্জ্বলের ভিতরের ঈর্ষা ও স্বার্থপরতায় সচেতন হয়ে ছন্দাকে সতর্ক করে সে। যে কোনো দুঃখী নারীর মধ্যে নিজের ব্যাথাকাতর মায়ের মুখটি সে দেখতে পায়, অসহায় পবিত্রর জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে, অবলীলায় তার মধ্যে জেগে ওঠে প্রতিরোধের আগুন সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে। শোষিত পবিত্র তখন উপলক্ষ মাত্র। গুণধরের ব্যক্তি নিরপেক্ষ প্রতিবাদী কণ্ঠ আসলে গর্জে ওঠে যাবতীয় শোষণের বিরুদ্ধে।

টিপ্পনী

"কে? কে কেড়ে নেবে? আমার আনন্দ, আমার গান, আমার হারমোনিয়াম, আমার অসুস্থ মা! আমার মেহনতের ফসল আমার গোলায় তুলতে দেবে না, সে হিম্মৎ কার?"

সেভাবে, যে পরিস্থিতি ও নাট্যমুহূর্তে গুণধরের মুখে এই সংলাপ উচ্চারিত হয় তাতেই নাটকটি আধুনিকতার শীর্ষসীমা স্পর্শ করে। অথচ ক্লিশে রাজনৈতিক আধুনিকতার শ্লোগান বা ফাঁকা বিপ্লবের বুলিতে পর্যবসিত হয় না সে উক্তি। বস্তুত শুষ্ক তত্ত্ব ও প্রথাসিদ্ধ শোষক-শোষিতের সংগ্রামের পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্ত বাংলা নাটকের দর্শকের কাছে গুণধর নিয়ে আসে মুক্ত হাওয়া - যা মতাদর্শ সর্বস্ব রাজনীতি সংকীর্ণ গন্ডি অতিক্রম করে মানুষকে চিহ্নিত করে মানুষেরই স্বরূপে। ফলত এ নাটকের কোনো চরিত্রই সম্পূর্ণ কালো বা সম্পূর্ণ সাদা রঙে চিত্রিত হয় না। আমাদেরই অতি পরিচিত পরিবেশ থেকে উঠে আসা কান্না-হাসির চিরন্তন দোলায় আন্দোলিত কিছু সাধারণ মানুষের অবয়ব এ নাটকে রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফলে গুণধরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েও তার বাবার স্বাভাবিকত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ওই বৃদ্ধের অসহায়তাও শেষ পর্যন্ত পাঠককে স্পর্শ করে।

অবশেষে দেখা যায়, গুণধর স্বার্থের সংঘাতদীর্ণ পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। দমবন্ধ কর পরিবেশ ও প্রাত্যহিকতার দংশন থেকে তার মুক্তি অসম্ভব। আর তাই সে হারিয়ে যায় বৃহত্তর জনারণ্যে। তবে গুণধর মনেনি, সে ছড়িয়ে আছে মানুষেরই সমাজে - আমাদের বিবেকের মধ্যে সঙ্গোপনে। তাই তার ক্লান্তিহীন সন্ধানেই হয় নাটকের পরিসমাপ্তি। একদিক থেকে দেখতে গেলে গুণধরের অসুখকে মানুষের সুখে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে ওই পলায়নের বিকল্পও সম্ভবত নেই। কেননা আমাদের অসুস্থ পৃথিবীতে আত্মানুসন্ধানের সুযোগই যে তাহলে দুর্লভ হয়ে পড়বে। আর এভাবে খোঁজ করতে গিয়েই আমরা জানতে পারি গুণধর আজও বেঁচে আছে অসংখ্য মানুষের মধ্যে। নাট্যকার মন্তব্য করেছেন -

"হঠাৎ কখনও শোনা যায়, অমুক অমুক অফিসার ঘুষ খান না। কোনো কোনো পুলিশের কবিতার বই বেরোয়। একজন দুঃস্থ মহিলা একটি ভ্যানিটিব্যাগ ভর্তি টাকা এবং সোনার গয়না কুড়িয়ে পেয়েও থানায় জমা দিয়ে আসেন। বিশ্বাস করতে হবে, এদের কারো সঙ্গেই গুণধরের দেখা হয় নি?"

-এই প্রশ্নের উত্তর আমরা সবাই জানি। ভিড়ের বাসে যে যুবকটি অন্যকে সিট ছেড়ে দেয় সহাস্যে - সে-ই গুণধর, যার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে অনাত্মীয়ের সামান্যতম দুঃখেও তারই

নাম গুণধর।

## বর্তমান সমাজে ‘গুণধরের অসুখ’-এর প্রাসঙ্গিকতা ঃ

টিপ্পনী

নাট্যকার বা পরিচালক নয়, নাটকের দলের সকলেই একটা চরিত্রের সন্ধানে ব্যস্ত। অভিনয়ের শুরু এবং শেষে সমবেত দর্শকদের কাছেও তাই আন্তরিক আবেদন থাকে, যদি এই অন্বেষণ কর্মে তাঁরাও অংশগ্রহণ করেন। যাকে খোঁজা হয় সেই গুণধরের নামটা নাটকীয় হলেও সে কি চেহারায়, চরিত্রে কোনও অসাধারণ মানুষ? সাধারণ অর্থের উত্তরে বলা যায় – না। তবে তার একটা স্থায়ী অসুখ আছে যার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াতে গুণধর মিথ্যে বলতে পারে না। তার আচার আচরণ কথাবার্তা এখনকার চরিত্রহীন সময়ে দুর্লভ। স্বার্থতাড়িত হিসেব সে বুঝতে পারে না। নিজস্ব ইচ্ছের স্বরলিপি উচ্চারণে সে অস্বাভাবিক রকমের স্বাভাবিক। তাই সে হাসি ভালোবাসে, অন্যের দুঃখে কাতর হয়ে পড়ে। কান্না ভালোবাসে না বলে অন্যের কান্না ঘোচাতে ব্যাকুল হয়। প্রায় সকলেই নিশ্চিত বুঝে গেছে, গুণধর খুবই বোকা। নইলে কেউ বর্ষার জলে পছন্দমত কাগজের নৌকা ভাসাতে না পারলে সে দুঃখিত হবে কেন। বাবার দোকানেও সে খুব যোগ্য কর্মী নয়। চক্রবর্তীর কাছ থেকে সে পাওনা টাকা আদায় করতে পারে না। দুঃস্থ যে কোনো মহিলাকেই তার নিজের মা বলে মনে হয়।

গুণধরের বাবার দোকানে ফোন করতে আসা উজ্জ্বল চাকরিতে উন্নতি করেছে। কিন্তু তার বাবা অসহায় অবস্থায় টাকা চাইলে উজ্জ্বল তারস্বরে হিসেব শোনায়। তাতে গুণধরের মানসিক যন্ত্রণা বেড়ে যায়। উজ্জ্বল, ছন্দা, পবিত্রর মধ্যেকার সম্পর্ক আর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী পবিত্রর মা – এই জটিল ও দুঃখময় পরিস্থিতির বাইরে থেকেও সরে যেতে পারে না গুণধর। গুণধর পুরনো স্মৃতি নির্ভুল চেহারায় চোখের সামনে দেখতে পায়। টেলিফোনের একপ্রান্তের কথা শুনেই অন্য প্রান্তের মানুষের মনের কথা জেনে যায় সে। অনেক দিনের অনেক গানের স্মৃতি, স্মৃতির সুর জড়ানো হারমনিয়ামটি যে পবিত্রর পাঁজরের হাড়, তা বুঝতে পেরে যন্ত্রণায় ছটফট করে গুণধর। গুণধরের চিকিৎসা করেন যে ডাক্তারবাবু, তিনিও কোনও অসুখ খুঁজে পেলেন না, বরং গুণধরের সঙ্গে দেখা হওয়ার অনেক বিনিদ্র রাতের পর ডাক্তারবাবু ঘুমোতে পেরেছেন।

অন্যরকম মূল্যবোধ, মানবিকতায় অভ্যস্ত সরল মনের মানুষ গুণধরকেও শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বের যন্ত্রণা বিদ্ধ করতে থাকে। পবিত্রদের পাশে না দাঁড়িয়ে তার উপায় নেই। নাটকটি দেখার পর দর্শকদেরও গুণধরকে মনে মনে খোঁজা শুরু হয়ে যায়। ভাঙা আয়নাতেও মুখ দেখতে চায় মানুষ। চলে যাওয়ার আগে গুণধর আমাদের চারপাশের মানুষদের যেন নতুন করে চিনিয়ে দিয়ে যায়। জাগিয়ে দিয়ে যায় অন্য ধরনের তৃষ্ণা। তৃষ্ণার্ত হয়ে স্বাভাবিক ভালোবাসা, সহানুভূতি আর সাহায্যের জন্য গুণধরের মতো কোনও অমল হৃদয়ের সন্ধান করতে হয়। ততক্ষণে সত্যিকারের অসুখে অসুস্থদের সামাজিক ঠিকানা জানা বাকি থাকে না। ‘গুণধরের অসুখ’ নাটক আসলে প্রাণের আনন্দ অন্বেষণের এক প্রয়াস। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে গুণধরকে খুঁজে পেতে হবে। আমাদের জীবনে লুকিয়ে থাকা অশুভ আচরণ, অসুস্থতা মুছে ফেলার বার্তা জারি করেছে ‘গুণধরের অসুখ’।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে একজন গুণধর – যে হাসি ভালোবাসে, কান্না যার ভালো লাগে না বা দুঃখের কথায় যার চোখে জল আসে। হয়তো সবাই হাসি ভালোবাসে বা বলা ভালো সবারই হাসি ভালোবাসা উচিত, বা বলা যায় কান্না কারোরই ভালো লাগে না বা দুঃখের কথায় সবারই চোখে জল আসা উচিত। কিন্তু এমন হাসি, ভালোবাসা বা দুঃখের কথায় চোখে জল আসার সুস্থ এবং স্বাভাবিক বৃত্তি সবাই ধরে রাখতে পারছে না। হিসেব আর লেনদেন কেড়ে নিয়েছে এই সুস্থ এবং স্বাভাবিক বৃত্তি। গুণধর কোথাও অসময়কে মেনে নেয় নি, মানুষের হেরে যাওয়াকেও না। তাই স্বার্থসর্বস্ব কলুষ পৃথিবীতে গুণধর বা গুণধররা আশ্চর্য নিটোল কিছু মানুষ হয়ে আজও সভ্যতার অহঙ্কারকে ধুলোয় মিশতে দেয় নি।

টিপ্পনী

আজ মানুষের এই পৃথিবীর দুর্দিন। শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষ আজ দুঃসময়, দুর্দিনের শিকার। সে প্রতিদিন হারাচ্ছে মানবতার অধিকার। সংকীর্ণতা ও তুচ্ছতায় আবিল হচ্ছে মানবতার ঐশ্চর্য। বিশ্বায়ন, খোলা অর্থনীতির প্রবল অমানবিকতা মানুষকে নিঃস্ব ও শূন্য করে দিতে চাইছে। তবু মানুষ মানুষই থেকে যাচ্ছে শেষপর্যন্ত। এখানেই মানুষ মহান, অফুরান। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের হেরে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া কোনো বড়ো কথা নয়। একটি প্রজাতি হিসেবে মানুষ শেষ পর্যন্ত অপরাজেয়। গুণধররা সেই অপরাজেয় মানুষের প্রতীক এবং প্রতিনিধি। মানুষ কেমন হয়ে যাচ্ছে, তার থেকে অনেক বড়ো মানুষ কেমন হয় বা মানুষের কেমন হওয়া উচিত। গুণধরদের সংখ্যাটা ভয়াবহ দ্রুততায় হয়তো কমছে সারা পৃথিবীতে – কিন্তু সেটা শূন্য হবে না কোনোদিন। কোথাও না কোথাও একজন না একজন গুণধর ঠিক থেকে যাবে। প্রতিকূলতা আর কতটুকু? তার চেয়ে অনেক বড়ো জীবন। জীবন ছাপিয়ে যাবে সব প্রতিকূলতাকে – এই অমোঘ বিশ্বাস নিয়েই সভ্যতার জয়যাত্রার রথ টেনে নিয়ে যাবে গুণধররা।

নাট্যকার প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী 'গুণধরের অসুখ'-এ পথ খুঁজেছেন। সভ্যতার সংকটে শীর্ণ হয়ে আসা মানবতার যে পথ সেই পথের সন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন গুণধরদের। সভ্যতার পথের মতো গুণধররাও অনিঃশোষিত। যে মানুষরা গুণধরের জগতের কেউ নয়, তাদের কাছে গুণধর অসুস্থ এবং অস্বাভাবিক এক ধ্বস্ত সময় চিহ্নিত হয়ে যায় – যে সময়ে মানুষকে ভালোবাসা মানুষের ব্যাথায় চোখে জল আসা, মানুষের আনন্দ এবং হাসিকে নিজের আনন্দ এবং হাসি মনে করা অসুস্থতা এবং অস্বাভাবিকতা অপরিমেয় স্বাভাবিক এবং সুস্থ গুণধরদের সন্ধান এবং আবিষ্কার আজ বড়ো প্রয়োজন। সত্তা আর অস্তিত্বের লড়াইয়ে নির্মমভাবে পরাস্ত অগণিত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হয়েছে এই শতাব্দীর যাত্রা। গুণধর এখানে বিজয়ী। তার সত্তা অস্তিত্বের বন্ধন ছিন্ন করেছে। তাই সে চিনতে পারে উজ্জ্বলদের ভিতর ও বাইরের স্বার্থপর, কলুষ রূপ – আপন পিতার মধ্যে খুঁজে পায় এক দানবকে। পবিত্রর মা এখ লহমায় হয়ে যায় তার নিজের মা – এই মায়ের মৃত্যু তার চোখে জল এনে দেয়। খোলা অর্থনীতি, বিশ্বায়নের শৃঙ্খল যেন চুরমার করে দেয় গুণধর এবং গুণধররা।

প্রদ্যোৎ চক্রবর্তীর এই নাটকের গঠনে কিছু শিথিলতার বা ঢিলেঢালা ভাব হয়তো রয়েছে। গুণধরকে মেলে ধরতে গিয়ে অন্য চরিত্রের প্রতি হয়তো তিনি খানিকটা অমনোযোগী হয়ে পড়েছেন। আবার এও মনে হয়, একটা অন্যরকম বাস্তবতার সন্ধান করতে গিয়েই হয়তো এমনটি সচেতনভাবেই তিনি করেছেন। আজ মানুষকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস আর স্বপ্নের পৃথিবী। তাই গুণধরদেরই আজকের নাটকে বড়ো করে তুলতে হবে – বড়ো করে দেখাতে হবে। গুণধরদের মধ্য দিয়েই ভাষা পাবে শতাব্দীর আর্তি, তার স্বপ্নভাঙা, স্বপ্ন

দেখা। তাই আজকের সমাজে 'গুণধরের অসুখ'-এর প্রাসঙ্গিকতা অপরিহার্য।

## সংগীতের ব্যবহার ঃ

টিপ্পনী

'গুণধরের অসুখ' নাটকে মোট পাঁচটি গান ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে একটি লোক-সংগীত ও অপর চারটি রবীন্দ্র-সংগীত। সবগুলো গান-ই শোনা গেছে গুণধরের কণ্ঠে। গান এই নাটকের এক বড়ো সম্পদ। নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে গানগুলি। তাছাড়া সংলাপের পরিপূরক হয়েও দেখা দিয়েছে এই গান। প্রত্যেকটি গানই নাটকীয় তাৎপর্য সৃষ্টিতে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি নাটকের সামগ্রিক ভাববস্তু তুলে ধরতে সহায়তা করেছে। তাছাড়া যে গুণধর চরিত্রটি নাট্যকারের মূল লক্ষ্য তাকেও পূর্ণতা দান করেছে গানগুলি। অনেক কথা যেগুলো হয়তো সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে গেলে নাটকের সংহতি ক্ষুণ্ণ হতো, তা অতি সহজেই গানের মধ্যে, সুরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা গেছে, আর এই গানগুলি সহজেই পাঠকের হৃদয়কেও স্পর্শ করে। যখন কথার অতীত কোনো ভাব বুঝতে বা ব্যক্ত করতে সমস্যা হয়, তখন সেই অব্যক্ত ভাবকে সহজেই উপলব্ধি এবং প্রকাশ করা যায় গানের মধ্য দিয়ে - সুরের মধ্য দিয়ে।

'গুণধরের অসুখ' নাটকের প্রথম যে গানটি আমরা গুণধরের কণ্ঠে শুনতে পাই সেটি হচ্ছে 'পাগল হইয়া বন্ধু পাগল বানাইলে পাগল!' - এই গানটি একটি লোকসংগীত। সহজ লোকগানের সুর আর কথা ফিরিয়ে দেয় মাটির গন্ধ, ভালোবাসার পৃথিবী। এই পৃথিবী আজ এক দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত। মানুষ ক্রমশ মানুষের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। একধরণের অহংবোধ ও স্বার্থলোলুপতা মানুষের মানবিক গুণাবলীকে নষ্ট করে দিচ্ছে - মানুষ হয়ে পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক। অপরের দুঃখে মানুষ উদাসীন থাকে - অপরের সুখে, অপরের আনন্দে মানুষ ঈর্ষান্বিত হয়। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত আচরণ করেও মানুষ আত্মশ্লাঘা অনুভব করে - নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে দাবি করে। এই সমস্ত আচরণ করে যে সব মানুষ নিজেদের সুস্থ-স্বভাবিক মনে করছে, আসলে তারা নিজেরাই এক দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত। আর তাই এর ব্যতিক্রম ঘটলেই তাদের অস্বাভাবিক মনে হয়। অন্যের দুঃখে কষ্ট পাওয়া, সমব্যথী হওয়া, অন্যের সুখে সুখী হওয়া, অন্যের মুখে হাসি ফোটানো তাই তাদের কাছে পাগলের পাগলামো বলেই মনে হয়। আর সেজন্যেই গুণধররা তাদের কাছে পাগল আখ্যা পায়। অথচ প্রকৃত অর্থে পাগল তারাই যারা গুণধরদের পাগল ভেবে আত্মগৌরব লাভ করছে। 'পাগল হইয়া বন্ধু পাগল বানাইলে' - এই গানটি নাটকে তিনবার গুণধরের কণ্ঠে শোনা গেছে। গানটি নাটকের মূল ভাববস্তুকে যেমন তুলে ধরেছে, তেমনি গুণধরের কণ্ঠে গানটি শুনে আমরা যারা গুণধরদের পাগল সাব্যস্ত করেছি, তারা পুণরায় আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ পাই। এই গানটিকে তাই নাটকের 'থীম সং' বলা যেতে পারে।

নাটকের দ্বিতীয় গান - 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ও বন্ধু আমার' - এই রবীন্দ্রসংগীতটি গুণধর গেয়েছে। গানটির নিজস্ব যে ভাব রয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে এসে গুণধরের নিজস্ব যে চিন্তাভাবনা, যে আচরণ তার নিরিখে এক স্বতন্ত্র মাত্রা লাভ করেছে। আধুনিক সভ্যতার চোরাবালিতে আটকে পড়া মানুষের কাছে গুণধর অস্বাভাবিক। অহংসর্বস্ব পৃথিবীতে

মানুষ নিজের চারপাশে গড়ে তুলেছে এক আত্মকেন্দ্রিকতার অচলায়তন, যে অচলায়তন ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে। সমাজের সংকীর্ণ গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের তথাকথিত স্বাভাবিকতাকে বিশ্লেষণ করে প্রকৃত কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে - গুণধরদের স্বীকৃতি দিতে হবে। যাদের পাগল বলে দূরে সরিয়ে রেখেছি তাদের সঙ্গে এক আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। মানুষ যে সংকীর্ণতার মধ্যে বাস করছে, যে আত্মকেন্দ্রিকতা, যে অহংসর্বস্বতা মানুষের মনকে কলুষিত করে রেখেছে তা থেকে বেরিয়ে এক নির্মল পৃথিবীর জন্ম দিতে হবে যেখানে মানুষ অপরের আনন্দে সামিল হবে, অপরের দুঃখের অংশীদার হবে। সেই দিন হয়তো আসবে, যেদিন তিমির-বিদায়-উদার অভ্যুদয় ঘটবে; অমানিশা দূর হয়ে দেখা দিবে এক নতুন ভোর - দেখা দিবে এক নতুন সূর্য, যার আলোতে সমস্ত কুয়াশা কেটে যাবে। প্রাত্যহিকতার সীমা পেরিয়ে এক নতুন জগৎ ও পথের সন্ধান করতে হবে। সে সন্ধান মূলত আত্মানুসন্ধান, সে সন্ধান প্রকৃত অর্থে নিজের বিবেকের সন্ধান - নিজেকেই খুঁজে পাওয়া।

টিপ্পনী

এই নাটকের তৃতীয় গান 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে'। এটিও একটি রবীন্দ্র-সংগীত যেটি গীত হয়েছে গুণধরের কণ্ঠে। এই গানটির মধ্য দিয়ে বিশ্বভুবনের সঙ্গে একাত্মবোধের কথা বলা হয়েছে। মানুষ যে সংকীর্ণতার বেড়াজালে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে এই আলোকময় পৃথিবীতে উন্মুক্ত আকাশের নিচে সকলের সঙ্গে এক আসনে সমবেত হতে হবে। তবেই প্রকৃত মুক্তি ও যথার্থ স্বাধীনতা সম্ভব। যান্ত্রিকতার অহমিকা চূর্ণ করে দিয়ে এই ধুলো-মাটির পৃথিবীকে আপন করে নিতে হবে। ছোটো ছোটো ঘাসের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে প্রাণরস খুঁজে নিতে হবে - তাহলেই আমরা ছোটো আমিকে বর্জন করে 'বৃহৎ আমি'কে মুক্ত করতে পারবো। এই গানের মধ্য দিয়ে প্রাত্যহিকতার সীমা পেরিয়ে, জৈবিক চাহিদা, লোভ-হিংসা-দ্বেষ সব ভুলে মুক্তির আনন্দে নিজেকে অন্য এক জগতে হারিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে - যেখানে মানুষ মুক্ত, কথার জটিলতা মানুষকে আক্রান্ত করবে না, গানের সুর সকলের সঙ্গে যোগ ঘটাবে।

এই নাটকে পবিত্রর মা মারা যাবার পর গুণধরের কণ্ঠে 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে'-এই রবীন্দ্র সংগীতটি গীত হয়েছে। এই গানের মধ্য দিয়ে সংকীর্ণতা ও তুচ্ছতার সীমা পেরিয়ে চলে আসার কথা বলা হয়েছে। সমস্ত জাগতিক বন্ধন অতিক্রম করে বাস্তবতার বড়ো পৃথিবীকে সকলের সামনে উন্মোচিত করতে হবে - যেখানে বৃহতের সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটবে। আমাদেরত অন্তরেই রয়েছে যে শুভ চেতনা, নির্মল বিবেক - সেই আলোকময় শুভবোধকে, শুদ্ধ বিবেককে সন্ধান করতে হবে। আশা রাখতে হবে একদিন 'আমি'-র অস্তিত্ব লোপ পেয়ে সব 'তুমি'-ময় হয়ে উঠবে।

নাটকের অন্তিম পঞ্চম গানটিও শোনা গেছে গুণধরের কণ্ঠে। নাটকের শেষে গুণধর নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিয়েছে। আর তখনই নেপথ্যে থেকে গুণধরের কণ্ঠে গীত হয়েছে, 'এ পরবাসে রবে কে হায়'। ভালোবাসার অনিকেত পৃথিবী হারিয়ে গেছে। লাভ-ক্ষতি, পাওয়া-না পাওয়ার হিসেবের গোলকধাঁধায় আজ মানুষ বিভ্রান্ত। মানুষের কোনো স্বাধীনতা নেই, কোনো মৌলিক চিন্তা নেই - সর্বদা এক জটিল দূরারোগ্য ব্যধিতে মানুষ আক্রান্ত। কেউ কারো প্রতি সহমর্মী নয় - সবাই যেন স্বগৃহে পরবাসী হয়ে রয়েছে। আর তাই এই আত্মকেন্দ্রিক জগৎকে 'পরবাস' ভেবে বেরিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে এই গানের মধ্য দিয়ে।

## অসুখের আক্রান্ত হো'ক পৃথিবা ঃ

'প্রাচী ধরিত্রী' পত্রিকায় বিশাখ দত্ত নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে যে সমালোচনা করেছিলেন তা উপস্থাপন করা যেতে পারে ঃ

টিপ্পনী

নাটকটি দেখার পর একথাই প্রথম মনে এসেছিল আমার, যে অসুখে গুণধর আক্রান্ত সমগ্র পৃথিবীময় তা ছড়িয়ে পড়ুক। আমরা যারা ছোট্ট ছাতার আড়াল দিয়ে বিরাট আকাশটাকে ঢেকে দিতে চাই, 'যারা নিজেরাই এক একটা কানা গলির পথ' তারা হয়তো চমকে উঠবো এই অসুখে আক্রান্ত হবার কথায় - আজ 'ছোট আমির' দাপটে 'বড় আমি' চাপা পড়ে গেছে, সমস্ত পৃথিবীটা আর 'বিশ্বভুবন' বলে ব্যাপ্ত নয়, ছোট, ছোট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুতে আজ বিভক্ত মানসিকতা, কুয়োর ব্যাঙ-এর মত শুধুই চারপাশের ঘেরাটোপের ভিতরে আবর্তিত হওয়া - এর মধ্যেই গুণধরের মত মানুষগুলি অন্যের কষ্ট দেখলে যাদের চোখের পাতা সিক্ত হয়ে ওঠে, রাতে কেউ ঘুমাতে না পারলে তার কষ্টে বিনিদ্র রজনী যাপন করে ঐ মানুষগুলি - এমন মানুষের সংখ্যা দিন, দিন কমে আসছে, বিশ্বজুড়েই আজ কুটিল স্বার্থবাজদের দাপাদাপি তৃতীয় বিশ্বের অনাথ শিশুদের আকুল কান্না থামাতে আজ আর কেউ পাশে দাঁড়াবার নেই, আফ্রিকার কালো যেসব মানুষেরা মুক্তির আকূলতায় মাথা কুটে মরছে তাদের পিপাসার জল আজ কষ্টলভ্য, স্বাধীনতা, সাম্য শুধু পাগলের প্রলাপ। তবুও গুণধরের মমত মানুষগুলি মাঝে মাঝে আমাদের বদ্ধ জলায় আলোড়ন তুলে সব হিসাবকে ওলট-পালট করে দেয়। আমরা ভাবতে বসি অসুখটা কার? আমাদের না গুণধরের মত ঐসব মানুষের?

নাট্যকার প্রদ্যোৎ চক্রবর্তীকে উষ্ণ অভিনন্দন - আজকের পটভূমিতে এমন একটি উজ্জ্বল, মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ নাটক উপহার দেবার জন্য। চরিত্র বিরল এই নাট্য কথার অন্তরালে অন্তর্লীন সুর হিসাবে ভেসে আসে সেইসব বিরল অনুভব যা আমাদের হিসাবী মনকেও বেহিসাবী করে, সচেতন করে দেয় পৃথিবীর গভীরতর অসুখ সম্পর্কে, যে অসুখ আজ আমাদের বহুদিনের বহু প্রচেষ্টায় তিল তিল করে গড়ে ওঠা 'বড়ো আমি'র ভাব-সত্তাকে চোরাস্রোতে আক্রান্ত করে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

বন্ধ দরজা দেখে কষ্ট পাওয়া গুণধরের কষ্ট আমাদের চেতনাকেও ধীরে ধীরে স্পর্শ করে। আমরা বোধ হয় ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারি এই অসুখের স্বরূপ, উচ্চগ্রামে, রং-তামাশার বোলে হুল্লোড় না করে, আরোপিত আশাবাদের হাতছানি উপেক্ষা করে ধীরে ধীরে নাটকটি এক ঝলক উদার মুক্ত বাতাসের মত আমাদের জুড়িয়ে দিয়ে যায়। বলা এবং না বলার মধ্যে যে আরো অতিরিক্ত অনুক্ত সংলাপ থেকে যায় যার অস্তিত্ব থাকে সংবেদনশীল দর্শকের অনুভবে - একথা আবার নতুন করে মনে পড়ল গুণধরের আলগা নড়বড়ে অথচ অনুভবে গভীর সংলাপে যার মধ্যে 'আমাদের শতধাদীর্ণ অস্তিত্ব প্রতিফলিত।' এই নাটকটি তাই আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার পর্পণ।

'আনন্দধারা' সাংস্কৃতিক সংস্থা এই নাটকটি পরিবেশন করে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে উঠলেন। এবার নাটকের অভিনয়াংশের দিকে দৃষ্টিপাত করি। প্রথমেই মনে আসে গুণধরের ভূমিকায় অচ্যুত চক্রবর্তীর অনন্য অভিনয়ের কথা। নাটকটি দর্শকমন্ডলীকে যে আবিষ্ট করে রাখে তার একটি বড় কারণ গুণধরের ভূমিকাভিনেতার অসাধারণ উপলব্ধি-সঞ্জাত অভিনয়। ব্যক্তিগতভাবে এই সমালোচকের মনে হয়েছে অচ্যুতের এতাবতকালের মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ

অভিনয়। না বলা বাণীকে দর্শকের অনুভবে পৌঁছানোর কঠিন দায়িত্ব কি সহজ সাবলীলভাবে পালন করলেন অচ্যুত। তার কথা, তার দৃষ্টি, তার অঙ্গসঞ্চালন সব কিছু মিলে যে সামগ্রিকতা – বহুদিন স্থানীয় মঞ্চে দেখিনি। ২৯ শে সেপ্টেম্বর, ৯১–র সন্ধ্যায় রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, সেন্ট্রাল পান্ডু মঞ্চে অচ্যুতের অভিনয় নিমগ্ন করে রেখেছিল দর্শকমন্ডলীকে। অভিনন্দনযোগ্য শ্রীযুক্ত প্রতীপ ঘটক, প্রতীপের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব অচ্যুতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সঙ্গতি রেখে অভিনয় যা নাটককে সফল করে তুলতে, দৃশ্যকাব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ সাহায্য করেছে। তবে প্রতীপের অভিনয় আরো সাবলীলতা দাবী করে বিশেষ করে কোম্পানীর পদস্থ কর্মী হিসাবে। মাঝে, মাঝে ঝুকে যাওয়া, নাটকে ব্যবহৃত আসবাবকে ভর হিসাবে সাহায্য নেওয়া–প্রতীপের এই দুর্বলতাগুলি চোখে লাগে। নাটকের একটি প্রধান চরিত্র সূত্রধার – যে ভূমিকায় অশোক সেনগুপ্তকে দেখা গেল। চরিত্রটি অশোকের অভিনয়ে সম্পূর্ণ খুলে বের হয়ে আসতে পারে নি, অভিনয়ের জড়তা মাঝে, মাঝেই দর্শককে ধাক্কা দেয়। ডাক্তাররূপী অশোক চরিত্রটিতে কোনো মাত্রা যোগ করতে পারেননি। আগামীতে জড়তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হ'লে অশোক দর্শকের মন জয় করতে সফল হবেন। গুণধরের বাবার ভূমিকায় প্রদীপ মিত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ। গুণধরের বাবা হিসাবে তার চরিত্রের অসহায়তা ও অবোধ সন্তানের জন্য অন্তঃসলিলা স্নেহ সবকিছু মিলিয়ে চরিত্রটির যে রূপ আমরা আশা করি সেই কাঙ্খিত অভিনয় কিন্তু প্রদীপ মিত্রের কাছ থেকে পাওয়া গেল না। প্রদীপের মাথায় ব্যবহৃত বৃদ্ধের যে চুল তার সঙ্গে সঙ্গতি নেই, প্রদীপের আচরণ বা বাচনভঙ্গীর বয়সের ছাপ চুলেই থাকল, অভিনয় বা অঙ্গ–সঞ্চালনে বয়সের কোনো ছাপ পড়ল না। নাটকে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হিসাবে ভূমিকা গ্রহণ করেছে সংগীত যাকে বাদ দিয়ে এ নাটক অসম্ভব। গানগুলি সুপ্রযোজ্য ও সুগীত। আলো এই নাটককে সফল করতে বিশেষ সাহায্য করতে সক্ষম হয়নি।

নাটকে গুণধরের মা কে মঞ্চে আনলে কি নাটকের দিক হতে কোনো অসঙ্গতি হয়? গুণধরের মায়ের যে অভিব্যক্তি তা বোধ হয় কোনো পুরুষ অভিনেতার অভিনয়ে প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়। নাট্যকারকে এই ব্যাপারটি ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। সবশেষে ছেট্ট একটি কথা – এ নাটকে গুণধরের চরিত্রে ক্ষীণভাবে 'ডাকঘরে'র অমলের ছায়াপাত ঘটেছে। 'গুণধরের অসুখে'র দর্পণে আসুন আমরা খুঁজে বেড়াই আমাদের সত্তার গভীরে নিবিষ্ট সেই অসুখকে যার দূরীকরণের মধ্যে আমরা আবার আমাদের অনুভবে উপলব্ধি করব 'বড়ো আমি'র ব্যাঞ্জনাকে।

## গুণধরের অসুখ ঃ বিষণ্ণ–মধুর চরিত্রের ছটায় উদ্ভাসিত মঞ্চ ঃ

'গুণধরের অসুখ' নাটকটির মঞ্চে উপস্থাপন সম্পর্কে বিভাস চক্রবর্তীর সমালোচনা ঃ

গুণধর নামক ছেলেটির এক বিষম অসুখ। অসুখের লক্ষণ সাংঘাতিক মারাত্মক। যেমন, কাউকে হাসতে দেখলে তার ভাল লাগে, কেউ কষ্ট পাচ্ছে বা কাঁদছে দেখলে তার খারাপ লাগে। এই অস্বাভাবিক লক্ষণগুলির জন্য পাড়ার লোকেরা নিশ্চিত যে গুণধর একটি হাবাগোবা পাগলা। অল্পবয়সিরা তাকে ক্ষেপিয়ে আনন্দ পায়। আর ওরা আনন্দ পায় বলে গুণধর সানন্দে ওদের খোরাক হতে রাজি হয়। ওর বাবা সামান্য দোকানদার এহেন পুত্রকে সামলাতে হিমশিম।

সততা বা স্পষ্টবাদিতার জন্য যাদের পাগল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয় তারাই যে আসলে

টিপ্পনী

খাঁটি মানুষ, বাকিরাই যে অস্বাভাবিক - এমন প্রতিপাদ্য গল্পে নাটকে আমরা অনেক দেখেছি কিন্তু আলোচ্য নাটকে এই সত্যটিকে চমকপ্রদ টুকরো টুকরো ঘটনায় অভিনব ভাবে গেঁথেছেন নাটককার। তুলির সামান্য আঁচরে এক একটি চরিত্রের স্কেচ এঁকেছেন। সরস ঝকঝকে সংলাপের ছড়াছড়ি। এমন বিষয় বা কাহিনী নিয়ে ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে নাটক করাই যেত, কিন্তু অসাধারণ সংযম এবং পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন নাটককার এই নির্মেদ ঝরঝরে নাটকের নির্মাণে। উজ্জ্বল-পবিত্র সম্পর্কের মধ্যে গুণধরের অনুপ্রবেশ এক অদ্ভুত নাটকীয় উদ্ভাবন। গুণধর এমনতর মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক মধুর 'ইন্টারভেনশনিস্ট' হয়ে দাঁড়ায়। রচনারীতিতে কোথাও যেন মোহিতীয় 'টাচ' বা পরশ পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বৈব মৌলিক এই নাটকটির রচয়িতা প্রদ্যোৎ চক্রবর্তীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। গুয়াহাটিবাসী এই নাটককারকে আমাদের অভিনন্দন। ধন্যবাদ দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই আবিষ্কারের জন্য। নাটকটি যেন তাঁরই জন্য লেখা। এ ধরণের নাটকের প্রতি দ্বিজেনের পক্ষপাতিত্বের কথা আমরা জানি। লক্ষ করেছি, এ জাতীয় নাট্যে তাঁর স্ফুরণ ও স্ফূর্তি। মনোমত মালমশলা পেয়ে তাকে আপন খেয়ালখুশিতে সাজিয়েছেন দ্বিজেন। মঞ্চসজ্জা সামান্য, প্রায় কিছুই নেই, একটি মনোহারী দোকান বাঁ দিকে, ডান দিকে কয়েকজন অভিনেতা, বাজনদার। এটুকু সাজানোতেই তড়িৎ চৌধুরীর কারুকৃতি লক্ষ্য করার মতো। কণ্ঠ ও বাদ্যযন্ত্রের টুকরো টুকরো ধ্বনির ব্যবহার অমোঘ। আর অচ্যুত চক্রবর্তীর কণ্ঠে গীত গান এক বিষাদঘন লৌকিক আবহের সৃষ্টি করে। মঞ্চে অভিনেতাদের বিন্যাসেও সংক্ষিপ্তি এবং পরিমিতি। সারা মঞ্চ দাপিয়ে অভিনয় একমাত্র দ্বিজেনই করেছেন সুপরিকল্পিতভাবে। এক বিষণ্ণ মধুর চরিত্রের ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মঞ্চ। অভিনয় ছাত্রদের কাছে শিক্ষণীয় তাঁর বাচিক শারীরিক অভিনয়। বাংলা মঞ্চে লোকজীবনের খোলা হাওয়া বইয়ে দেন অচ্যুত চক্রবর্তী তাঁর সহজিয়া গানে আর অভিনয়ে। তাঁর সহজতা, সরলতা, সরসতা এবং সূক্ষ্মতা মুগ্ধ করে আমাদের। উজ্জ্বল ও পবিত্র-র ভূমিকায় শংকর দাস ও অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায় প্রায় চার বর্গফুট জায়গায় দাঁড়িয়ে স্বল্প পরিসরে দুটি চরিত্রের অবস্থান, সম্পর্ক, সমস্যা ও দ্বন্দ্ব অনায়াসে ফুটিয়ে তুললেন - এও এক নতুন অভিজ্ঞতা। উজ্জ্বলের অসহায় বাবা, সংবেদী সমব্যথী মনোবিদ কিংবা অচল পয়সার মা চরিত্র মুহূর্তে মূর্ত হয়ে ওঠে পরিচালকের কল্পনা ও পরিকল্পনার গুণে এবং অবশ্যই সুকান্ত গুহরায়, শ্রীকান্ত মান্না এবং অন্তরা বসাকের রূপায়ণে। বাদল দাসের আলোতেও সেই সরলতা, অলক্ষ্যে পালন করে যায় নাট্যনির্মাণে তার অনিবার্য ভূমিকা।

টিপ্পনী

## মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যচিন্তা এবং গণধরদের সুখ-অসুখ ঃ

নাট্য-সমালোচক পাচু রায়-এর 'গুণধরের অসুখ' নাটকটির সমালোচনা এখানে উপস্থাপনযোগ্য ঃ

শম্ভু মিত্রর জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে বাংলা আকাদেমিতে একটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন হয়েছিল। বক্তা মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি কুমার রায়। সেই বক্তৃতা বা বক্তৃতা সভার ভালমন্দ এই রচনার উদ্দেশ্য নয়। কিছু অভিনব কথা মোহিতবাবু শুনিয়েছেন। যে কথা উৎসারিত হয়েছে চল্লিশ বছরের বেশি সময়ে গভীর এবং নিরন্তর নাট্যচর্চায় মগ্ন এক প্রগাঢ় বোধের নিভৃত প্রকোষ্ঠ থেকে। যে বোধ অর্জনের পশ্চাদপটে থাকে পরিশ্রমী মেধা, যে বোধ কখনও বর্জন করা যায় না এবং যে বোধ দাবি করে আরও অনেকের অংশীদারি।

‘চন্দ্রালোকে অগ্নিকান্ড’ কিংবা ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’র মধ্যে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কোন নাট্যকর্মটি আগে দেখেছিলাম ঠিক মনে করতে পারছি না। শ্যামল ঘোষ তথা নক্ষত্র তখন এইসব নাট্যকর্মের প্রযোজক। শ্যামলবাবুর পরিচালনায় মোহিতবাবুর তৃতীয় যে নাটকটি দেখেছিলাম তার নাম ‘ক্যাপ্টেন হুররা’। আমার দেখা ওঁর চতুর্থ নাটকটির পরিচালক ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী, থিয়েটার ওয়ার্কশপের ‘রাজরক্ত’। এই চারটি নাটকের মধ্যেই, ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারব না, ‘রক্তকরবী’র কোথায় যেন একটা প্রভাব ছিল। এটা একজন সাধারণ দর্শকের উপলব্ধি, এর বেশি কিছু নয়। প্রসঙ্গত, বলে রাখি, সেই ষাট-সত্তর দশকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের আরও একটি উল্লেখযোগ্য নাটক ছিল - ‘সিংহাসনের ক্ষয়রোগ’। সেই নাটকের সংলাপ ছিল কবিতার মত। রানীর কপালের স্বেদবিন্দু কবে মুছে গেছে, কিন্তু তার স্মৃতি আজও উজ্জ্বল।

টিপ্পনী

সেদিনের আলোচনায়ও মোহিত তুললেন ‘রক্তকরবী’র কথা। বললেন, ডি.এল. রায়ের ‘সাজাহান’ থেকে রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’তে উপনীত হতে একটা জাতির একশো বছর লাগার কথা। রবীন্দ্রনাথের মতন প্রতিভার কাঁধে চেপে নিমেষে অতিক্রম করা যায় এই দীর্ঘ সময়। এক কলমের খোঁচায় কাজটা করে দেয় প্রতিভা। মোহিতবাবু আক্ষেপ করে বলেছেন, এই অতিক্রমের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি বাঙালির নাট্যচর্চা। তখনও নয়, এখনও নয়। ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’, ‘চন্দ্রালোকে অগ্নিকান্ড’, ‘ক্যাপ্টেন হুররা’ এবং ‘রাজরক্ত’র পর ওঁর লেখা ‘মহাকালীর বাচ্চা’ দেখেছিলাম থিয়েটার ওয়ার্কশপের উদ্যোগে। একটু হতাশ ও হয়েছিলাম। যে ধারা নিয়ে মোহিতবাবুর বাংলা নাট্যঅঙ্গনে আবির্ভাব, সেই ধারা থেকে সরে এসে কাহিনী নির্ভর চিরাচরিত প্রথার কাছে উনি আত্মসমর্পণ করলেন বলে তখন মনে হয়েছিল।

সেদিনের আলোচনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায় দুটি কথা খুব প্রত্যয় নিয়ে বলেন। প্রথমত, নাটক স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বিষয়, সাহিত্যের কোনও দূরসম্পর্কের শাখা নয়। সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার আগেই মাইমের মাধ্যমে নাটকের জন্ম। মানুষ স্বপ্নের মধ্যে নিজেই এক নাট্যকার এবং প্রযোজক, একমাত্র দর্শকও বটে। স্বপ্ন যাঁরা ব্যাখ্যা করেন তাঁরা বলেন, স্বপ্নের ফর্মের মধ্যে এক ধরণের ননসেন্স যেমন থাকে, তেমন এর উপাদানের গভীরে থাকে বাস্তব এবং যুক্তি। স্বপ্নের দর্শক তাই কখনও নির্লিপ্তির শিকার হয় না, বরঞ্চ কখনও অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া জানায়। ঘুম থেকে জেগে উঠে বহুক্ষণ স্বপ্নের ঘোরে অচ্ছন্ন থাকে। অথচ আপাতদৃষ্টে স্বপ্ন একটা ননসেন্স, প্রবন্ধের মতন বা অধিকাংশ নাট্যকর্মের মতন পারস্পর্যের প্রতি গভীর অভিনিবেশ এবং যত্ন স্বপ্নে কখনওই থাকে না।

ঠিক এইরকমই প্রচলিত পারস্পর্যকে বর্জন করে অনেকটা স্বপ্নের মেকানিজমে আপাত যুক্তিবিন্যাসে একটু দূরে সরিয়ে রেখে ঠিক স্বপ্নেরই মতন, আবেগকে বিন্দুমাত্র বর্জন না করে, গোটা প্রেক্ষাগৃহকে আবেগে আপ্লুত করে সম্প্রতি ‘সংস্তব’ নাট্যসংস্থা আমাদের উপহার দিলেন ‘গুণধরের অসুখ’। নাটকটি দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য অভিনয় এবং প্রায় অবিস্মরণীয় পরিচালন কর্মের অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর। প্রদ্যোৎ চক্রবর্তীর এই নাটকটির এক অর্থে তেমন কোনও সাহিত্যগুণ নেই, এমনকি এটি পড়তে পাঠকদের কতটা ভাল লাগবে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কিন্তু নাটকটি যথাযথ মঞ্চস্থ হওয়ার পর আমাদের এই আশ্চর্য জীবনের এক অভিনব প্রতিফলন হয়ে সে দর্শককে মাতিয়ে দেয়। সব চরিত্রই চেনা, গুণধর তো বটেই। কিন্তু তার এমনই অসুখ যে অসুখের যাবতীয় কথাবার্তা মরচে পড়া পেরেকের চেহারা নিয়ে হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। অসুখ সারাতে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলে গুণধরকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর যে অভিজ্ঞতা হয়

তা কি দর্শকরা কখনও তুলবেন? নিজের বক্তব্য বলতে গিয়ে প্রচন্ড দৃঢ়তার সঙ্গে মোহিতবাবু সেদিন বললেন, আমাদের নাট্যচর্চা এক বদ্ধ জলায় আবদ্ধ আছে। থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। এখন প্রায় একই ধরণের কাহিনি এবং ক্লান্তিকর মঞ্চসজ্জার ভারে আক্রান্ত বাংলা থিয়েটার। মোহিতবাবুর কথা অধিকাংশ নাট্য প্রযোজন প্রসঙ্গেই সত্য, সত্যিই সাম্প্রতিক সময়ের অধিকাংশ নাট্যচর্চায় দর্শকের এবং অভিনেতারও কল্পনাশক্তির ডানা নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলার আয়োজন এক কথায় সমূহ। মঞ্চসজ্জা, আলো, পোশাক পরিকল্পনা – সব মিলিয়ে দর্শককে যেন এক বদ্ধ জলার মধ্যেই আবদ্ধ রাখা হয়। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সামর্থ নিয়ে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা যখন করে গোবরডাঙা শিল্পায়নের মতন কিছু অনামী দল, তাদের 'মালাডাক' বা 'স্বপ্নের ফিরিওয়ালা' নামক প্রযোজনার মাধ্যমে তখন বহু সমালোচক তাদের দিকে বল্লম (অবশ্যই ভোঁতা) উঁচিয়ে ধরেন। অবশ্য বিভাস চক্রবর্তী নান্দীপটের 'মৃত্যু না হত্যা' এই ধরণের নাট্যকর্ম হয়েও অকুণ্ঠ প্রশংসায় আপ্লুত।

টিপ্পনী

'গুণধরের অসুখ' এমন একটি দৃষ্টান্ত যেখানে বদ্ধজলায় জোয়ার আনার প্রয়াস উন্মুক্ত হয়েছে। উন্মুক্ত হয়েছে বাঁধ ভাঙার প্রয়াস। অত্যন্ত সহজ অথচ শিল্পময় মঞ্চসজ্জায় উপস্থাপনার উপায়ে এবং বক্তব্যের বিষয়ে। আমাদের স্বার্থময় আত্মকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে এ যেন এক খোলামেলা তলোয়ার খেলা। আমি জানি না মোহিত চট্টোপাধ্যায় দ্বিজেনবাবুর এই নাট্যকর্মটি দেখেছেন কি না। তাঁর অভিনব 'মুষ্ঠিযোগ' ছিল এমনই এক ছকের বাইরে খেলা নাটক। আর দ্বিজেনও ছিলেন যেখানে স্বরাজ্যে স্বরাট। মোহিতবাবুর 'ভূত' করেছিল নান্দীমুখ, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সেটিও ছকের বাইরের নাটক। মোহিতবাবু তাঁর কলম উঁচিয়ে চেষ্টা করেছেন আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণের সামঞ্জস্যে নাট্য নির্মাণের। আবার কখনও কখনও আত্মসমর্পণ করেছেন প্রচলিত ছকের কাছে। বাংলা নাটকের নাট্যকার, পরিচালক, দর্শক, অভিনেতা – সকলেই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কথা শিরোধার্য করুন, সচেতন হন আবার 'গুণধরের অসুখ'ও দেখুন। 'গুণধরের অসুখ' ছোঁয়াচে হয়ে সম্প্রসারিত হোক। সঙ্কুচিত হোক আমাদের স্বার্থপর, হিসেবি সুখ। সহস্র রজনীর সফল নাটক অস্তে যাক, 'গুণধরের অসুখ' এবং 'স্বপ্নের ফিরিওয়ালা'র আরও ছড়িয়ে পড়ুক পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। এই আশায় বাঁচি।

## খ) উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতা ঃ

উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতা বলতে উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্য সমন্বিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রচিত বাংলা কবিতাকেই বোঝায়। তবে আমাদের আলোচ্য কবিতাগুলি মূলত আসামের বরাক উপত্যকা কেন্দ্রিক। উত্তর- পূর্ব ভারতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা থাকলেও কাব্য-আন্দোলন ও লিটল ম্যাগাজিন ভিত্তিক বাংলা কবিতার চর্চা সব থেকে বেশি হয়েছে আসামের বরাক অঞ্চলে। ষাটের দশকে বরাক উপত্যকায় 'অতন্দ্র' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত কবিরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিমল চৌধুরী, উদয়ন ঘোষ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এঁদের সঙ্গে পরে যোগদান করেছিলেন - জিতেন নাগ, করুণাসিন্ধু দে, রুচিরা শ্যাম প্রমুখ। শুধু কবিতার জন্যই 'অতন্ত্র' পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছিল। আমেরিকার 'বিটনিক' কবি সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়েছিল পঞ্চাশের দশকের 'কৃত্তিবাস' আন্দোলনে। 'কৃত্তিবাস' আন্দোলনের প্রভাব বরাক উপত্যকায় ষাটের দশকে 'অতন্ত্র' আন্দোলনের সূচনা করে। ১৯৫৭ সালে করুণাসিন্ধু দে ও ত্রিদিব মালাকারের সম্পাদনায় হাইলাকান্দি থেকে কবিতা পত্রিকা 'স্বপ্নিল' প্রকাশিত হলেও 'অতন্ত্রে'র মধ্য দিয়েই বরাক উপত্যকার কাব্যের জগতে আধুনিকতার সূচনা হয়। আরও যে সমস্ত পত্রিকা আসামের বাংলা কবিতা চর্চার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - ক্ষিতীশ রায় ও ঊর্ধ্বেন্দু দাশ সম্পাদিত 'সংবর্ত', বিমল সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সংঘাত', নৃপতিধর চৌধুরী ও পরাগ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'প্রথম পরিচয়', অমৃতলাল বিশ্বাস ও সুভাষ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'সীমান্তের কথা', বেনুমাধব গোস্বামী, কুলদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'মুরজ' প্রভৃতি।

মূলত চারজন কবির কবিতা আমাদের আলোচনার বিষয়। এই চারজন কবি ও তাঁদের কবিতাগুলি হলো - হেমাঙ্গ বিশ্বাস-এর 'শিলঙের চিঠি', অশোক বিজয় রাহার 'ডিহাং নদীর বাঁকে', শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর 'উনিশ মে ১৯৬১, শিলচর' ও অমিতাভ দেবচৌধুরীর 'বরাক ভ্যালি এক্সপ্রেস'। এই চারজন কবির চারটি কবিতাই স্থান কেন্দ্রিক এছাড়া প্রথম কবিতাটি বাদে বাকি তিনটি কবিতাই আসামের বরাক উপত্যকা কেন্দ্রিক। এবারে একে একে এই চারজন কবি ও তাঁদের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

### হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঃ

হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২-৮৭) বাংলা ও অসমের গণসংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা, কবি, সংগীতকার ও গায়ক। গণসংগীত ও লোকসংগীত রচয়িতা ও বিশ্লেষক হিসেবে তাঁর মূল পরিচিতি। 'মাউন্টব্যাটন মঙ্গলকাব্য', 'বাঁচবো বাঁচবো রে আমরা', 'ঢাকার ডাক', 'শঙ্খচিল', 'কল্লোল', 'জন হেনরি' ইত্যাদি সব থেকে জনপ্রিয় সৃষ্টি। তিনি 'সুর্মা ভ্যালি কালচারাল স্কোয়াড' ও 'অসম গণনাট্য সঙ্ঘ' তৈরি করেছিলেন। এছাড়া তেলেঙ্গানা পরবর্তী গণনাট্যে'র বিপ্লবী সংস্কৃতি লাইনের মূল প্রস্তাবকও ছিলেন তিনি। ১৯৩৭-৩৮ থেকে ১৯৬৪-তে বিভাজনের সময় পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে গানের দল 'মাস সিঙ্গার্স', 'ডা. কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটি' ও 'ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি'র নেতৃত্ব দেন। তাঁর প্রকাশিত বইগুলি হলো - 'বিষাণ' (১৯৪৩), 'সীমান্ত প্রহরী' (১৯৬১, ২০০৮), 'কুলখুড়ার চোতাল'

টিপ্পনী

(১৯৭০, ১৯৮৫, অসমীয়া), 'আকৌ চিন চাই আহিলোঁ (দুই খন্ড ১৯৭৫ ও ১৯৭৭, অসমীয়া), 'আবার চীন দেখে এলাম' (১৯৭৫), 'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ঃ বাংলা ও আসাম' (১৯৭৮), 'হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান' (১৯৮০)। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'উজান গাঙ বাইয়া' (১৯৯০), গানের বাহিরানা (১৯৯৮) ও অসমীয়া রচনা সংকলন 'হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনাবলী (২০০৮)।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্ম আসামের সিলেট বা শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মিরাশী গ্রামে। গ্রামের অসম্ভব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্মৃতি কথায় তিনি জানিয়েছেন –

টিপ্পনী

"গ্রামের পুবদিকে ত্রিপুরার পাহাড়চূড়া – আঠারোমুড়া পাহাড়চূড়া দেখা যেত। মেঘমুক্ত দিনে পুবদক্ষিণ কোণের আঠারোমুড়া পাহাড়ের 'কাইল্যাছালির' টিলা আমার কিশোর মনকে ভীষণ আকর্ষণ করত। কেন জানি না, পরেও নদীর থেকে পাহাড় আমায় টানে বেশি। আর টানে শুকনো নদী–বালির চর ঝিলমিল ঝিলমিল করে – যেমন ছিল খোয়াই, পশ্চিমে বয়ে যাওয়া শীর্ণস্রোতা, ঝলমল বালুর পাহাড়ি নদী। সাধারণ নদীর মতো না – অন্যরকম কিছু যেন জাগাত আমার মনে।"

তাঁর বাবা হরকুমার বিশ্বাস ও মা সরোজিনী বিশ্বাস। হরকুমার ছোটো জমিদার হলেও গ্রামের সব থেকে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সাংগীতিক জীবনে মায়ের অবদান ছিল অনেকখানি। তাঁদের বাড়িতে কবিগানের ঐতিহ্য ছিল। গ্রাম ছেড়ে কিছুকাল ডিব্রুগড়ে ছিলেন তিনি। তারপর সেখান থেকে হবিগঞ্জে ফিরে আসেন পড়াশুনা করতে। পরবর্তী সময়ে আইন অমান্য আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি ১৪৪ ধারা ভেঙে মিটিং করার অপরাধে তাঁর কয়েকমাসের জেল হয়। হবিগঞ্জ জেল থেকে প্রথমে সিলেট জেল এবং পরে নগাঁও জেলে স্থানান্তরিত হন তিনি। গান্ধি–আরউইন চুক্তির ফলে আসামের বিভিন্ন জেল থেকে সত্যাগ্রহীরা ফিরে আসেন। হেমাঙ্গও ছাড়া পান মেয়ান্দ শেষে। এরপর তিনি আরো জোড়ালোভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং বিভিন্ন জনসমাবেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে রাজদ্রোহমূলক কথা বলার অপরাধে তিনি দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হন। এবারে আড়াই বছরের কারাদন্ড হয় তাঁর। গৌহাটি জেলে থাকার সময় তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল শিলঙের রবিনহুড 'উ বালিওয়েল'–এর সঙ্গে। বালিওয়েলকে অন্যান্য কয়েদিরা সমীহ করে চলত। বালিওয়েলের সঙ্গে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল। টিবি রোগ হওয়ায় ১৩ মাস জেলে থাকার পর গৌহাটি জেল থেকে তিনি ছাড়া পান।

কংগ্রেসী রাজনীতির অগ্রণী ব্যক্তি বিধানচন্দ্র রায় প্রতি গ্রীষ্মে শিলঙ যেতেন। সেখানে হেমাঙ্গ বিধানচন্দ্রকে নিজের অসুস্থতার কথা বলেন। বিধানচন্দ্রের চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ হয়ে তিনি গ্রামে ফিরে আসেন। কিন্তু পুনরায় অসুস্থ হয়ে তিনি চলে আসেন যাদবপুর টিবি স্যানিটেরিয়ামে। সেখানে এসে মার্কস ও এঙ্গেল্‌সের বই পড়ে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা বদলে যায়। এরপর মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে তিনি দীর্ঘকালের বন্ধু চন্দননগরের ডাঃ জয়গোপাল মুখার্জিকে সঙ্গে নিয়ে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য চলে আসেন শিলঙে। এই শিলঙের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমাদের আলোচ্য হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কবিতাটিও এই শিলঙকে কেন্দ্র করেই। শিলঙের প্রাকৃতিক পরিবেশ তাকে বরাবর মুগ্ধ করেছে। বেশ কয়েকবার তিনি শিলঙে এসেছেন। শিলঙের মানুষ, প্রকৃতি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আর তাই

বিভিন্ন সময়ে তাঁর স্মৃতিতে শিলঙের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। রাণু বিশ্বাসকে লেখা চিঠিতেও তিনি শিলঙের কথা বারে বারে উত্থাপন করেছেন। রাণু বিশ্বাসও তাঁকে অনেক চিঠি লিখেছেন। এই চিঠি আদান-প্রদানের প্রতিক্রিয়াতেই লিখিত তাঁর 'শিলঙের চিঠি' কবিতাটি।

টিপ্পনী

## শিলঙের চিঠি

এখানে স্তরে স্তরে উত্তুঙ্গ সবুজ
গাঢ় নীল,
গাঢ় ঘন নীল হয়ে
কালো মেঘে লীন।
মেঘের পিঙ্গল চোখে হঠাৎ বর্ষণ ঃ

নীলিমার ঢালু বেয়ে
সিঁদুরের ঢল নেমে আসে।
শিলাঘাতে শতদীর্ণ শীকর-কণারা
ছিটকে পড়ে
তৃষাতপ্ত রজঃস্বলা
লুইত উপত্যকায়!

তোমার চিঠিএল ঃ
নীলখামে মোড়া
লাল আখরের অভিমান।
ফসলের স্বরলিপি।

বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী হেমাঙ্গ বিশ্বাস লোক-সংগীত শিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। তবে তিনি বেশ কিছু বাংলা ও অসমিয়া ভাষায় কবিতাও রচনা করেছিলেন। বাংলা ও অসমিয়া ভাষায় তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ হলো 'সীমান্ত প্রহরী', 'কুল খুড়ার চোতাল'(১৯৭০-৭১)। 'শিলঙের চিঠি' কবিতাটি 'সীমান্ত প্রহরী' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কবিতায় শিলং পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবির অনুভূতির স্পর্শে অনবদ্য শিল্পরূপ লাভ করেছে। তাছাড়া যে সময়ে কবিতাটি লেখা হয়েছে তখন অসমিয়া ও খাসিয়াদের মধ্যে বিদ্বেষ প্রবল আকার ধাণ করেছে। শিলঙে খাসিয়ারা অসমিয়াদের দেখলেই হত্যা করছে। অন্যদিকে আসামে অসমিয়ারা বাঙালিদের ওপর খজ্জহস্ত। গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম শারিক হেমাঙ্গ বিশ্বাস ভূপেন হাজারিকাকে সঙ্গে নিয়ে খাসিয়া, নেপালি, অসমিয়া, বাঙালি সকলের মধ্যে মৈত্রী ও একতার বার্তা পৌঁছে দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, সর্বজাতীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

শিলং পাহাড়ের সঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নিবিড় সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। এই আত্মিক সম্পর্কের পরিচয় রয়েছে স্ত্রী রাণু বিশ্বাসকে লেখা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের চিঠিতে। হেমাঙ্গ লিখছেন -

"আমার সঙ্গে আমার জীবনের প্রতিটি পর্বের সঙ্গে শিলং পর্বতের পরিচয় আছে। ইচ্ছা হয়, তোমাকে সে সব লিখি।"

হেমাঙ্গ বিশ্বাস যখন নয় বছরের কিশোর, তখন প্রথম শিলঙে আসা। তখনকার শিলং তাঁর কিশোর চোখে ছিল রূপকথা আর খাসিয়ারা ছিল সেই 'রূপকথার দেশের অপরূপ মানুষ'। সেটা ছিল শিলঙের সঙ্গে প্রথম পরিচয় এবং ভালোবাসা মেশানো এক অদ্ভূত শিহরণ। এরপর ১৯৩৩ সাল। জেল থেকে ভগ্নস্বাস্থ্য ও ভগ্নমন নিয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে শিলঙে এলেন হেমাঙ্গ। শিলঙে আরণ্যক পরিবেশ তাকে কতটা আকৃষ্ট করেছিল তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট –

"যদিও এসেছিলাম বিশ্রামের জন্য কিন্তু আরণ্যক আবহাওয়ায় শিকারীর মত ঘুরে বেড়াতাম।"

টিপ্পনী

হেমাঙ্গ বিশ্বাস তৃতীয়বার শিলঙে এলেন ১৯৩৭ সালে। যাদবপুরে চিকিৎসার পর শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে ফিরেছেন। পাশাপাশি মাননসিকভাবেও তাঁর চিন্তা ও চেতনায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। তিনি তখন পুরোপুরি কমিউনিস্ট। এই সময়ে তিনি ছিলেন লাইটুমখ্রার লুমবাউরী টিলায়। ১৯৪২ সালে তিনি পুনরায় শিলঙে আসেন। তখন তিনি বাড়ি থেকে বিতাড়িত, অসুস্থ ও অর্থহীন। সেই সময় অভুক্ত অবস্থায় অনেকদিন কাটাতে হয়েছে তাঁকে। কমিউনিস্ট শৈলেশ সেনগুপ্ত, অঞ্জলী লাহিড়ী ও খাসিয়া ইবনদির সঙ্গে তাঁর সেই সংকটের সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন। এরপর ১৯৪৬ সালে যখন তিনি শিলঙে আসেন তখন তিনি আসামের নবসংস্কৃতি আন্দোলনের নেতা। তাঁর গান সারা বাংলা ও আসামে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাংস্কৃতিক অভিযাত্রী দল নিয়ে তিনি আসাম সফরে বেরিয়েছিলেন – যা যুদ্ধোত্তর আসামে এনেছিল নতুন উদ্যম। সেখান থেকে এসে তিনি সুপর্ণা হোম ওরমে বুড়িদি-র বাড়িতে অনেকদিন ছিলেন। এই বুড়িদির দাদা বিজন ও বোন খুকু তাঁর গান সৃষ্টিতে প্রেরণা জুগিয়েছেন।

১৯৫৩-৫৪ সালে পুনরায় গণনাট্যের দল নিয়ে আসামের পুণর্জাগরণের মন্ত্রকে সামনে রেখে তিনি শিলঙে এসেছেন। এরপর ১৯৬০ সালে এসেছেন যখন আসামে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় জনজীবন বিপর্যস্ত। আসামের সংস্কৃতি আন্দোলন এবং গণনাট্য আন্দোলনের ভবিষ্যৎ যাতে অন্ধকারে ডুবে না যায় সে ব্যাপারে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি জানাচ্ছেন –

"তাই ভূপেনকে টেলিগ্রাম করে আনিয়াছি। আগামী শনিবার এখানে বাঙালী অসমীয়া সর্বজাতীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠান হচ্ছে মৈত্রী ও একতার জন্য।"

শিলঙের প্রাকৃতিক পরিবেশ তাকে চিরকাল মুগ্ধ করেছে। এখানকার সবুজ আরণ্যক পরিবেশ এবং আকাশে মেঘের ঘনঘটা ও বর্ষণ তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। পাশাপাশি লুইত উপত্যকায় গভীর সংকট তৈরি হয়েছিল এবং ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় রক্তাক্ত হচ্ছিল মানবতা। এই ঘটনা তাঁকে গভীরভাবে ব্যাথিত করেছে। শিলঙের চিঠি কবিতাটি সেই গভীর সংকটময় সময়কে তুলে ধরেছে।

## রামেন্দ্র দেশমুখ্য ঃ

বরাক অঞ্চলের বিশিষ্ট কবিদের একজন হলেন রামেন্দ্র দেশমুখ্য। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ৭২ বছর বয়সে তিনি মারা যান। জীবনে বিভিন্ন সময়ে নানা পেশার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো ঃ 'ধানক্ষেত', 'বহ্নিবাংলা', 'শতপুষ্প', 'অমৃতের স্বাদ' প্রভৃতি। আমাদের পাঠ্য কবিতাটি হলো ঃ

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

## জন্মভূমি, তোমাকে ভুলি না

যখন যেখানে থাকি জন্মভূমি তোমাকে ভুলি নে,
স্মৃতির আনন্দ তুমি, শৈশবের সবুজ শহর
চক্ষে আষাঢ়ের ধারা, বক্ষভারময়ী নদীজলে
গন্ধরাজ গোলাপের চোখের তারায়
হারানো কোমল সুরে বরাকের কুঞ্জতল থেকে
আমার মনের বৃন্দাবনে
আমাকে যে নিত্য দাও ডাক

অশ্রুমতী রূপালি বরাক
মর্মরিত বসন্তের বাঁশবনে শুয়ে
খোঁপায় মন্দার ফুল, পিছনে পাহাড়,
রূপসী রহস্যময়ী কত দিন ডাকোনি আমাকে,
মদিরাক্ষী মনে পড়ে আজ,
গোধূলি-বিমুগ্ধ আমি তোমারি মায়ায়
আমিই কিশোর শিলচর।

যখন যেখানে থাকি, মনে পড়ে সন্ধ্যার জোনাকি,
নাগেশ্বর, আমলকী, শিরিষের শোভা,
বরাকের শান্ত বাঁকে মদুরার মিলনমোহনা,
অমলধবল জ্যোৎস্না দুধপাতিলের শেষরাতে,
আশ্চর্য ট্রলির লাইন চলে গেছে চায়ের বাগানে,
মনে পড়ে শুভ্রবর্ণা মাকে
এবং তোমাকে।

টিপ্পনী

কবিতার নাম 'জন্মভূমি তোমাকে ভুলি না'। জন্মভূমি বলতে কবি নিজের জন্মস্থান বরাকভূমিকে বুঝিয়েছেন। বরাকের সবুজের সঙ্গে, নদীর জলের সঙ্গে, পুষ্পকুঞ্জের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে কবি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। বরাকভূমির সঙ্গে কবি আত্মিক সম্পর্কে সম্পর্কিত। কবির শৈশব কেটেছে যে শহরে তাকে কবি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, ভুলতে পারেন না। বরাকভূমি তাঁর অন্তরে সদা জাগ্রত। প্রতিনিয়ত কবিকে ডেকে চলেছে এই ভূমি।

বরাকভূমির রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি একে জীবন দান করেছেন। বরাক তাঁর কাছে শুধুমাত্র একখন্ডে ভূমি হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে 'অশ্রুমতি'। 'রূপালি বরাক' মর্মারিত বসন্তের বাঁশবনে শুয়ে আছে। খোঁপায় তার মন্দার ফুল। কবি বরাক ভূমিকে 'রূপসী' বলে যেমন সম্বোধন করেছেন, তেমনি 'রহস্যময়ী'ও বলেছেন। দীর্ঘদিন বরাক কবিকে ডাকেনি। কবি নিজেকে শিলচরের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন।

কবি সেখানেই থাকুন না কেন, বরাকের রাত্রি, সন্ধ্যার জোনাকি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মদুরার মোহনা, নির্মল সাদা জ্যোৎস্না, চায়ের বাগানে ট্রলির লাইন - এই সবকিছুই কবির স্মৃতিতে সদা ভাস্বর থাকে। কবি শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্মভূমিকে - এই বরাকভূমিকে নিজের গৌরবর্ণা মায়ের

সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন। আর তাই তিনি কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারেন না বরাকের সৌন্দর্যকে। মাকে যেমন প্রতিনিয়ত মনে পড়ে, বরাকভূমিও কবির অন্তরে প্রতিনিয়ত দোলা দিয়ে যায়। কবিতার একদম শেষে এসে কবি তাই বলেন;

"মনে পড়ে শুভ্রবর্ণা মাকে
এবং তোমাকে।"

টিপ্পনী

## অশোকবিজয় রাহা ঃ

অশোকবিজয় রাহা ১৯১০ সালের ১৪ নভেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা বঙ্কুবিহারী রাহা ও মা ব্রহ্মাময়ী রাহা। বাবা কাজ করতেন কাছাড়ের পার্বত্য অঞ্চলের এক চা বাগানে। চার ভাই বোনের মধ্যে সব থেকে ছোটো ছিলেন অশোকবিজয়। ছয় বছর বয়সে কাছাড়ে কাকা-কাকিমার কাছে আসেন। সেখানে ওই অঞ্চলের মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখানকার শিক্ষা শেষ করে চলে আসেন শ্রীহট্ট শহরে এবং একটি ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। সপ্তম শ্রেণিতে পড়বার সময়ই তাঁর কবিতা লেখা শুরু। শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত 'কমলা' পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের পর অশোকবিজয় শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ অশোকবিজয়ের কবিতা পড়ে প্রশংসা করেন। ১৯৩১ সালে মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে সাম্মানিক হন। ওই একই বছরে রবীন্দ্রনাথের জন্মের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রীহট্ট শহরে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী পরিষদ' গঠিত হয় এবং এই পরিষদের প্রতিনিধি রূপে অশোকবিজয় প্রথম কলকাতায় আসেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। জগদীশ ভট্টাচার্যের সঙ্গেও সে সময় তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

১৯৩২ সালে অশোকবিজয় শ্রীহট্টের প্যারীমোহন পাবলিক অ্যাকাডেমি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ওই বছরই তিনি প্রথম শান্তিনিকেতন আসেন। রবীন্দ্রনাথ তখন থাকতেন উত্তরায়ণের কবিকুটির কোণার্কে। সে সময় প্রায় এক সপ্তাহ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। প্যারিমোহন পাবলিক অ্যাকাডেমি স্কুলে শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি যোগ দেন শ্রীহট্টের মদনমোহন কলেজে। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এখানে অধ্যাপনা করেন তিনি। ১৯৪১ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ডিহাং নদীর বাঁকে' প্রকাশিত হয়। ওই একই বছর প্রকাশিত হয় 'রুদ্র বসন্ত'। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয় 'ভানুমতির মাঠ'। ১৯৪৫-এ তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'জল-ডম্বরু পাহাড়', 'রক্তসন্ধ্যা' ও 'শেষ-চূড়া' প্রকাশিত হয়।

১৯৩৭ সালে 'বলাকা' পত্রিকায় লেখার সূত্র ধরে অশোকবিজয় রাহা কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে শ্রীহট্ট জেলা গণনাট্য সংঘ গড়ে ওঠে। এই সংঘের সহ-সভাপতি করা হয় তাঁকে। পাশাপাশি প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক হন তিনি। ১৯৪৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে সিলেটের একটি প্রতিনিধ দল কলকাতায় ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে যোগ দেয়। শ্রীহট্টে থাকাকালীন 'মৈত্রী' ও 'জনশিক্ষা' নামক পত্রিকা দুটির যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯৪৭ সালের ১ জানুয়ারি মদনমোহন কলেজ ছেড়ে করিমগঞ্জ কলেজে যোগ দেন। ওই বছরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর হন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দশ বছর পর ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে যোগ দেন অশোকবিজয়। এই সময় থেকেই তিনি রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা করতে থাকেন ও প্রবন্ধ রচনায় মগ্ন হন। ১৯৫১ সালেই প্রকাশিত হয় 'উড়ো চিঠির ঝাঁক'। তাঁরই সম্পাদনায় 'রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা'র দ্বিতীয় খন্ড ও রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে 'সম্মেলনের কার্যবিবরণী'র চতুর্থ খন্ড প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীতে যোগ দেওয়ার পর তাঁর কবিতা লেখায় ভাঁটা পড়ে। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় 'যেথা এই চৈত্রের শালবন' কাব্যগ্রন্থ। এই সময় তিনি কিছুদিন রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন। এই সূত্রে তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করেছিলেন। ১৯৬৬ সালে 'সোভিয়েতল্যান্ড নেহরু অ্যাওয়ার্ড কমিটির আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধি রূপে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করেন। সেখানে মস্কোর ফ্রেন্ডশিপ হাউসে 'রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা' বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দেন। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর গদ্যগ্রন্থ 'বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ'।

টিপ্পনী

বিশ্বভারতী থেকে অশোকবিজয় অবসর গ্রহণ করেন ১৯৭৪ সালে। শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর 'সুরাহা' নামে নিজের বাড়িতে স্ত্রী সুপ্রীতি রাহাকে নিয়ে বাকি জীবন কাটান নিঃসন্তান এই দম্পতি। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ঘন্টা বাজে ঃ পর্দা সরে যায়' কাব্যগ্রন্থ ও বন্ধু জগদীশ ভট্টাচার্যকে লেখা আটটি পত্রের সংকলন 'পত্রাষ্টক'। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'পৌষ ফসল' ও লীলা রায় অনূদিত নির্বাচিত কবিতার ইংরেজি অনুবাদ 'The Enchanted Tree'।

অশোকবিজয় রাহা তাঁর নিজের জীবনের অনেক কথাই ব্যক্ত করেছেন জগদীশ ভট্টাচার্যকে লেখা আটটি চিঠিতে। এই চিঠিগুলি সংকলন গ্রন্থ 'পত্রাষ্টক'। এছাড়া কয়েকজনের স্মৃতিকথা থেকে তাঁর জীবনের অনেক অনালোকিত তথ্য পাওয়া যায়। কবিতা রচনার নেপথ্যে বন্ধুদের প্রেরণার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন অশোকবিজয় –

"কিশোর বয়সে যাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা দিয়েছিল তিনি আমার সমবয়সী বন্ধু শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র মিশ্র।"

এছাড়া কলেজ জীবনে তাঁর কবিতা রচনার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী। তাঁর কবিতার তন্নিষ্ঠ পাঠক ছিলেন এই রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী। তাঁর কবিতার প্রতি সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এই বন্ধুটি। আর সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাবাণী লাভ করেন অশোকবিজয়। ১৩৩৬ সনের ১০ পৌষ অশোকবিজয়ের কবিতার খাতার উপর লিখেছিলেন –

"তোমার কবিতাগুলিকে অকুণ্ঠিত মনে ভালো বলিতে পারিলাম। ইহার মধ্যে কেবল লেখার নৈপুণ্য নহে কবিত্বের পরিচয় পাইলাম।"

ছাত্র অবস্থায় তিনি অনেক বিশিষ্ট অধ্যাপকের কাছ থেকে কবিতা রচনার উৎসাহ লাভ করেছেন।

শ্রীহট্টের থাকাকালীন সমকালে যাঁরা কবিতা লিখতেন তাঁদের মধ্যে রসময় দাস, প্রজেশ কুমার রায়, কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মৃণালকান্তি দাস প্রমুখ তাঁর বন্ধু ছিলেন। এছাড়া 'বলাকা' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন দাসের উৎসাহে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন।

টিপ্পনী

অপর আর এক বন্ধু বিধুভূষণ চৌদুরীর সঙ্গে তিনি যুগ্মভাবে 'মৈত্রী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সুনামগঞ্জের অশ্বিনীকুমার শর্মা ও শিলচরের নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। শিলচরের তরুণ কবি সুধীর সেন ও রামেন্দ্র দেশমুখ্যের সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল। এছাড়া কবি করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর শ্রীহট্ট জীবনে ছাত্র ছিলেন। শ্রীহট্টের থাকাকালীন তাঁর বন্ধু ও শুভাকাঙ্খীর সংখ্যা নেহাত কম ছিল না।

শ্রীহট্টের পর কলকাতার অনেক কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল, আর এই পরিচয় কীভাবে গড়ে উঠেছিল তার উল্লেখ করেছেন স্বয়ং অশোকবিজয় -

"এরপর কলকাতার কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রসারিত হতে লাগল দুই ভাবে ঃ রচনা-প্রকাশের সূত্রে, আর ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে।"

তাঁর লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে শ্রীহট্টের 'বলাকা' পত্রিকা ও কলকাতার 'কবিতা' পত্রিকার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আর ব্যক্তিগত যোগাযোগে যে দুজন বন্ধুর দান স্মরণীয় তাঁরা হলেন বুদ্ধদেব বসু ও জগদীশ ভট্টাচার্য। চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় ঘটার ক্ষেত্রে দুটি প্রধান অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। একটি শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত ১৯৫৩ সালের 'সাহিত্য-মেলা', দ্বিতীয়টি ১৯৬১ সালে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত 'সাহিত্য-সম্মেলন'। পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ ও নবীন কবি-সাহিত্যিকরা এই দুই অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছিলেন। বন্ধু সৌভাগ্য অশোকবিজয়ের ব্যক্তি-জীবন ও সাহিত্য-জীবনকে করেছিল সমৃদ্ধ।

বাঙালির গ্রামীন জীবনের সঙ্গে অশোকবিজয়ের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। শ্রীহট্টের থাকার সময়েই শ্রীহট্ট, কাছাড় ও ত্রিপুরার বাঙালি পল্লীজীবনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ হন। তাঁর গ্রামীন জীবনের অভিজ্ঞতা আরো বিস্তৃত হয়েছে ঢাকা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে। শান্তিনিকেতনে আসার পরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম, আসানসোলের অনেক গ্রামে তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন। বীরভূমের সাঁওতালদের সঙ্গেও তাঁর হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কবিতা লেখার ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কাজে লেগেছে তাঁর। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন -

"আমার অনেকগুলি ছড়া ও কবিতায় ছড়িয়ে আছে তার প্রমাণ। দুঃস্থ পল্লীবাসীরাই বেশি করে আকর্ষণ করেছে আমার মন।"

১৯৫১ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে অশোকবিজয়ের তেইশ বছরের অধ্যাপনার অধ্যায়টি দীর্ঘতম। এই সময়ের মধ্যে এখানকার অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ছাড়াও আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের মতো বিদগ্ধ মানুষের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। এছাড়া নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী অনিলকুমার চন্দ, হরিদাস মিত্র, রামকিঙ্কর বেইজ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন আশ্রমের বন্ধু। অন্যদিকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বর্মণ, রাণী চন্দ, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট আশ্রমিকের আন্তরিক প্রীতি ও সৌহার্দ্য লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। পূর্বেই যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শান্তিনিকেতনে এসে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠতর

হয়েছে। এঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, লীলা রায়, লীলা মজুমদার, পুলিনবিহারী সেন, কানাই সামন্ত প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করতে আসা সৈয়দ মুজতবা আলি, ভূদেব চৌধুরী, মহেন্দ্র দত্ত প্রমুখের সঙ্গেও তাঁর মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিশ্বভারতী উপাচার্য, অধ্যাপক ও কর্মীদের সঙ্গেও তাঁর হার্দিক সম্পর্ক বজায় ছিল। তিনি সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বলেছেন –

"প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্যের বন্ধুত্ব আমার কাছে আজও প্রেরণার উৎস। এখানকার সকল বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও কর্মিদের অবিমিশ্র ভালোবাসা আমাকে প্রথম থেকেই অভিভূত করেছে।"

টিপ্পনী

দেশ-বিদেশের বহু ছাত্রছাত্রীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করেছিলেন অশোকবিজয়। ক্যালিফর্নিয়ার স্মল্, কেনিয়ার ওকেলো, মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিস্টার চেস্টার বোল্স্-এর মেয়ে সিন্থিয়া ছাড়া এদেশের শুভময় ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী ও বিশ্বজিৎ রায় তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছাত্র ছিলেন।

কর্মজীবনের সূত্রে অশোকবিজয়ের দেশ-বিদেশের বহু জায়গা যাবার সৌভাগ্য হয়েছে। দিল্লি-আগ্রা-বারাণসী, ভাগলপুর-পাটনা, রাজগীর-নালন্দা প্রভৃতি উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গা ছাড়া দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, ব্যাঙ্গালোর মৈশুর প্রভৃতি জায়গা তিনি ভ্রমণ করেছেন। বিদেশের মধ্যে তিনি গিয়েছেন মস্কো, কিয়ে ভ, লেনিনগ্রাদ প্রভৃতি জায়গায়। এছাড়াও টলস্টয়ের নিজের গ্রাম ইয়াস্নায়াপলিয়ান গিয়েছেন তিনি। মস্কো আর কিয়েভ্-এ রুশীয় ও ইউক্রেনী লেখক-সমিতির অনেকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিখ্যাত অনুবাদিকা ভেরা নোভিকোভার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্রেম্লিন, লেনিন মসলিয়াম, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়, মস্কো প্যানরামা প্রভৃতি স্থান তাঁর মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

অশোকবিজয়ের কবি-জীবনের সূচনা হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র হাত ধরে। ছেলেবেলায় কবিতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন অশোকবিজয়। কিন্তু হঠাৎ একটি কবিতার চারটি পংক্তি কীভাবে কবিতার প্রতি তাঁর বীতরাগকে অনুরাগে পর্যবসিত করেছিল তা তাঁর নিজের কথাতেই শোনা যাক্ –

"জানতাম না কী বই ওটা। পাতা উল্টোতেই চম্কে উঠি ঃ কী আশ্চর্য চারটি ছত্র চোখে পড়ছে আমার!

'যে আলোকে বাঁধন হরে
শিউলি মরে হেসে গো
সেই আলো লেগেছে আজি
আমার প্রাণে এসে গো।'

এ যে পিপাসার জল! কবিতা কি এমন করে প্রাণের কথা বলতে পারে?"

এরপর সত্যেন্দ্রনাথের 'ফুলের ফসল' ছাড়াও অসংখ্য কবিতা পড়েছেন তিনি। 'প্রবাসী' পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে গিয়ে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে। আর এরপরেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রেসে পড়ে যান তিনি শহরের প্রান্তে মানিক পীরের

টিলার গায়ে অসংখ্য পীর-ফকিরের কবর ছিল। সেই নির্জনতম প্রান্তে দাঁড়িয়ে তার স্বরে আবৃতি করেছেন রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি', 'সাজাহান', 'বলাকা', 'পুরস্কার' প্রভৃতি অসংখ্য কবিতা।

একদিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি প্রেম, অন্যদিকে রোমান্টিক ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি, বাইরণ, কীটস্ প্রমুখের কবিতার প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালোবাসা। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য অশোকবিজয় তাঁকে গুরুর আসন দিয়েছিলেন। অশোকবিজয়ের ভাষ্য অনুসারে-

টিপ্পনী

"আমার জন্মগত সংস্কার যাই থাক্, অন্তরের গভীর প্রত্যয় থেকে বলছি, রবীন্দ্রনাথ আমার গুরু।"

কথা বা অর্থের একাত্মতা এবং শিল্পসৃষ্টির কলাকৌশল তিনি শিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। এরপর তাঁর কবিতা রচনার স্বরূপ গেছে পাল্টে। তিনি জানিয়েছেন -

'দীক্ষার পর থেকে আমার আন্তরসত্তার চেহারাটি গেছে পাল্টে। সে নিজের মধ্যে ধরে রেখেছে দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু ঃ একটি তার সূক্ষ্ম শিল্পরুচিসম্মত পরিশীলিত রম্যবোধ, অন্যটি তার আবাল্যসঞ্চিত আরণ্যক জীবনের প্রাকৃত সংস্কার।

অশোকবিজয় ছিলেন প্রচারবিমুখ, নির্লোভ, আত্মমগ্ন এক কবি-মানুষ। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রশাসনিক স্বীকৃতি না পেলেও তা নিয়ে কোনো ক্ষোভ তাঁর মনে ছিল না। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত। অধ্যাপক হিসেবেও তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। কণ্ঠমাধুর্য ও বাচনভঙ্গির গুণে তাঁর পাঠদান অত্যন্ত মনোরম হয়ে উঠতো। তিনি পড়াতেন রবীন্দ্রসাহিত্য। তাঁর এক গুণমুগ্ধ ছাত্র স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখছেন -

"অশোকদা রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন বিশিষ্ট কবি ও একজন আদর্শ অধ্যাপক-এর চেয়েও বড় কথা, তিনি ছিলেন, একজন খাঁটি মানুষ। এমন সহজ-সরল সাদাসিধে হাস্যপ্রিয় মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। অধ্যাপক সুলভ গাম্ভীর্য তাঁর শিশুমনকে কখনোই আবৃত করেনি।"

১৯৯০-এর ১৯ অক্টোবর শান্তিনিকেতনের পিয়ারসন মেমোরিয়ল হাসপাতালের এই সহজ সরল, সাদাচারি মানুষটি দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নিজের কাব্যসাধনা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেন নি অশোকবিজয়। তবু যেটুকু জানিয়েছেন তাতেই তাঁর কবিধর্ম ও কাব্যভাবনা সম্পর্কে অনেকটা ধারণা পাওয়া যায়। নিজের কবিসত্তা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন -

"আমার মধ্যে আজীবন মিশে আছে তিনটি বিভিন্ন সত্তা ঃ একটি আদিম আরণ্যক, একটি প্রাকৃত গ্রামীণ আর একটি বিদগ্ধ নাগরিক। এদের মধ্যে আমার আরণ্যক সত্তার প্রভাবটাই বোধ করি প্রবলতম।"

আমাদের আলোচ্য 'ডিহাং নদীর বাঁকে' কবিতাটির মধ্যেও কবির সেই আরণ্যক সত্তারই প্রভাব লক্ষ করা যায়।

## ডিহাং নদীর বাঁকে

একটি রাতের একটুি দেওয়া নেওয়া
এই তো হল শেষ,
আজ সকালে পাহাড়-দেশের মেয়ে,
ছাড়ব তোমার দেশ।
মনের মাঝে ঘরছাড়া কেউ আছে,
চিনিনে কেউ তাকে,
যাবার বেলা বিদায় বলে যাব
ডিহাং নদীর বাঁকে।

দুয়ার ঠেলে একটুখানি হেসে
আবার ফিরে গেলে,
হঠাৎ তুমি একি নূতন বেশে?
বাহির হয়ে এলে?
বুকে তোমার আগুন-রঙের শাড়ি
আগুন যে ধারালো,
উঠল জ্বলে পাহাড়তলির বনে
বর্শা ফলার আলো।

কোথায় ছিল সবুজ বনের তলে
ওই আগুনের শিখা -
জিহ্বা মেলে হাজার বছর ধরে
তৃষার মরীচিকা?
ওই আগুনে পড়ছি তোমার মুখে
তারই অনল-গীতা,
জ্বলছে তোমার সর্ব দেহে বুকে
সর্বনাশের চিতা!"

টিপ্পনী

অশোকবিজয় রাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা হলো 'ডিহাং নদীর বাঁকে'। পাহাড়-দেশের মেয়েকে সম্বোধন করে এই কবিতা আরম্ভ হয়েছে। কবির 'উড়ো চিঠির ঝাঁক'-এ আমরা মণিপুরী রাসনৃত্যের ছবি দেখতে পাই। সেখানে পার্বত্য নারীদের উৎসব-সমারোহের চিত্রটিও সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। অন্যদিকে 'জল-ডম্বরু পাহাড়' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতার নায়ককে বলতে শুনি -

"তোমার দেশে আজ এসেছি মেয়ে,
এসেই দেখি বনের পাখা বৃষ্টি ঝেড়েছে
কচি পাতায় সোনালি রোদ খিলখিল,
ডালিমগাছে কাঠবিড়ালির ছুটোছুটি
ঢালুর ঘাসে হরিণ-শিশুর খেলা।

তোমার মুখে চেয়ে দেখছি মেয়ে,
তোমার কানে দু'টি লাল কাঞ্চনফুল,
বেণীতে সোনালতা।"

এখানে ভিন্‌দেশি পথিকের মনে পূর্বারাগের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু 'ডিহাং নদীর বাকে' কবিতায় দেখতে পাই ভিন্‌দেশি পথিকের সঙ্গে পর্বতবাসিনী মেয়ের নিবিড় অনুরাগের চিত্র। আর সেই অনুরাগ তো শুধু এক পক্ষের নয়। আর তাই এই কবিতার নায়ক যখন ডিহাং নদীর বাঁকে বিদায় জানানোর কথা বলে তখন সেই পর্বতবাসিনী মেয়েটি দুয়ার ঠেলে মুখে হাসি নিয়ে নতুন বেশে বাইরে বেরিয়ে আসে। নায়কের কথায় –

টিপ্পনী

"বুকে তোমার আগুন-রঙের শাড়ি
আগুন যে ধরালো,
উঠল জ্বলে পাহাড়তলির বনে
বর্শা-ফলার আলো।"

নায়িকার এই নতুন আবির্ভাবে চম্‌কে ওঠে নায়ক। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সে। নায়িকার বুকের আগুন-রঙের শাড়ি কবির বুকেও আগুন ধরিয়েছে। আর ওই আগুনই কবির দৃষ্টিতে অনল-গীতা হয়ে উঠেছে। কবি বলছেন –

"ঐ আগুনে পড়ছি তোমার মুখে
তারি অনল-গীতা,
জ্বলছে তোমার সর্ব দেহে বুকে
সর্বনাশের চিতা!"

নারী ও প্রকৃতি দুয়েরই আবেদন কবির কাছে ধরা পড়েছে সৌন্দর্যমূল্যে। কবি অশোকবিজয়ের কবিমানস যে ভোক্তা নয় – সৌন্দর্য-দ্রষ্টা তারই চিত্ররূপ এই কবিতায় ফুটে উঠেছে।

## শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ঃ

'অতন্দ্র' গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী (১৯৩৭-২০০৫) শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার সোনাইতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বরাক উপত্যকার শক্তিশালী আধুনিক কবি হিসেবে তিনি স্মরণীয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সময় শরীর হৃদয়' (১৯৭১)। এরপরে প্রকাশিত হয় 'এই পথে অন্তরা' (১৯৭৬), 'অনন্ত ভাসানে' (১৯৮৪), 'কাঠের নৌকা' (১৯১৪), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৯৫), 'লঘু পদ্য' (২০০০), 'দ্বন্দ্ব অহর্নিশ' (২০০৪) এবং অগ্রন্থিত কয়েকটি কবিতার সংকলন। এই কাব্য-কবিতার সংকলনগুলিতে কবির ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা ও প্রেমবোধের পরিচয় ধরা পড়েছে। বরাকের অন্যান্য কবিরা যখন নির্দিষ্ট ধারায় কাব্যচর্চায় মগ্ন ছিলেন, তখন শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতা ব্যতিক্রমী আস্বাদ নিয়ে আসে। মননে অনুভবে নিজের 'আবিস্কারী' মনোভাবের কথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে কবি নগর জীবনে বসবাস করেছেন। বাঁশের ঘরে কোনোরকমভাবে মাথা গোজার ঠাঁই হয়েছিল তাঁর। এই মানুষটিই জনতার স্রোতে মিশে গিয়ে হয়ে উঠেছিলেন

‘অতন্দ্রে’র প্রহরী। নিভৃত কবিমনে ভিড় করে আসতো ফেলে আসা দিনের অসংখ্য স্মৃতি। নগরে বাস করলেও তাঁর মন পড়ে থাকত গ্রামীণ পরিবেশে। আধুনিক বীতশ্রদ্ধ কবির বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছেন গ্রামীন লৌকিক জীবনের মধ্যে। গ্রামীন পরিবেশে বেড়ে ওঠা তরুণ কবিকে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। ক্ষয়িষ্ণু শহুরে জীবনের বিলাসিতার মধ্যেও তাঁর চিন্তাভাবনার জগৎ জুড়ে ছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। বরাক উপত্যকার পল্লিপ্রকৃতি তাঁর কবিতায় স্থান পেলেও সিংহভাগ জুড়ে আছে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি ও বাংলার নিসর্গ সৌন্দর্য। আমাদের আলোচ্য কবিতাটিতে প্রেম-প্রকৃতি বা নিসর্গ চেতনা থেকে সরে এসে শিলচরের প্রেক্ষাপটে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

টিপ্পনী

### উনিশে মে ১৯৬১ শিলচর

দশটি ভাই চম্পা আর একটি পারুল বোন
কলজে ছিঁড়ে লিখেছিল, ‘এই যে ঈশান কোণ-
কোন ভাষাতে হাসে কাঁদে কান পেতে তা শোন’।

শুনলি না? তো এবার এসে কুচক্রীদের ছা
তিরিশ লাখের কণ্ঠভেদী আওয়াজ শুনে যা -
‘বাংলা আমার মাতৃভাষা, ঈশান বাংলা মা।’

এই কবিতায় একটি বিশেষ তারিখের উল্লেখ রয়েছে। ১৯৬১ সালের ১৯ মে, স্থান শিলচর। ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিকে স্মরণ করে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের মর্যাদা পেয়েছে। অথচ স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শিলচরে বাঙালিরা নিজেদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য আন্দোলন করেছেন। ১৯৬১ সালের ১৯মে, ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট ও ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই তারিখগুলি বাংলাদেশের ২১ ফেব্রুয়ারির তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। কারণ এই তারিখগুলিতেও ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন অনেক তরুণ-তরুণী।

উত্তর-পূর্ব ভারতে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির বাস হওয়ার ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক বিভেদের পাশাপাশি উগ্র ভাষা-সাম্প্রদায়িকতা এই অঞ্চলের বাঙালিদের অস্তিত্বের সঙ্কটের সম্মুখীন করে তুলেছে। আর তাই নিজেদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার নিরন্তর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাদের এক স্বতন্ত্র পটভূমি রচিত হয়েছে। প্রাক্‌স্বাধীনকাল থেকেই অসমিয়াদের মধ্যে বাঙালি বিদ্বেষ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ লক্ষ্য করা যায়। ‘Assam for Assamese’-এই মনোভাব ও বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ বাঙালি অধ্যুষিত শ্রীহট্ট জেলাকে দেশ বিভাগের সময় তুলে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের হাতে। অসমিয়াদের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ফলে আসাম বিভক্ত হয়েছে। ‘আসাম কেবল অসমিয়ার জন্য’ - এই দাবি এবং আসামে বসবাসকারী অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়ার ফলে পাহাড়ি লোকেরা আসাম থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। শুধু তাই নয়, মিজোরাও আলাদা হয়ে গড়লেন মিজোরাম রাজ্য। অসমিয়াদের এই অমানবিক মনোভাব ও ঘৃণ্য চক্রান্তের ফলে বর্তমানেও আলাদা হতে চাইছে উত্তর কাছাড় এবং কার্বি আংলং, অন্যদিকে বড়োরা চাইছেন বড়োল্যান্ড।

টিপ্পনী

উত্তর- পূর্ব ভারতের প্রেক্ষিতে বাঙালিরা সংখ্যায় অসমিয়ার পরেই হওয়া সত্ত্বেও আলাদা রাজ্যের দাবি জানায় নি। তারা আসামে থেকেই নিজেদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আর সেই প্রয়াসেরই ফল হিসাবে ১৯৬১ সালের ১৯শে মে তারিখটি বাংলাদেশের ২১ ফেব্রুয়ারির মতোই সমান ভাস্বর। এই অঞ্চলের ভাষা আন্দোলনে শহিদ এগার জন তরুণ-তরুণীর স্মৃতি কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর মনে গভীর রেখাপাত করেছে।

'দশটি ভাই চম্পা' ও 'একটি পারুল বোন' - এই এগার জন তরুণ-তরুণীর ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের মাধ্যমে শহীদ হওয়ার ঘটনাটি উল্লেখের মধ্য দিয়ে কবিতাটি শুরু হয়েছে। তিরিশ লাখ বাঙালির মাতৃভাষাকে কণ্ঠবোধ করার যে প্রয়াস কুচক্রীরা করেছেন তাদের সমস্ত বাঙালির কণ্ঠভেদী আওয়াজ শোনার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে -

"বাংলা আমার মাতৃভাষা, ঈশান  বাংলা মা।"

কবিতার শুরুতেও একবার 'ঈশান কোণ' শব্দবন্ধের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা হলেও উত্তর-পূর্ব ভারতকে 'ঈশান বাংলা' বলা কতটা যুক্তিসঙ্গত।

দেশ বিভাগের ফলে ভারত ও বাংলাদেশের বাঙালিদের মধ্যে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিভাজনের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যেরও যে দুটি জগৎ তৈরি হয়েছে তা অনেকেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যের জগৎকে 'তৃতীয় ভুবন' নামকরণ অনেকে মেনে নিতে পারেন নি। কেউ কেউ আঞ্চলিক বিভাজনকে মেনে নিলেও 'তৃতীয় ভুবন' নামটি মেনে নেন নি। তাঁরা এই অঞ্চলটিকে 'ঈশান বাংলা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শক্তিপদ ব্রহ্মচারী এই কবিতায় 'ঈশান বাংলা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'ঈশান বাংলা' কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয়।

সাহিত্য কখনো স্থান-কাল নিরপেক্ষ নয়। আর তাই সাহিত্যে বিশেষ সময়ের বা বিশেষ স্থানের প্রভাব স্বাভাবিক তবে বিশেষ বিশেষ স্থান ও কালের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠলেও সাহিত্য মূলত একটিই - বাংলা সাহিত্য। অখন্ড বাংলা সাহিত্যই পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারত - বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। পশ্চিম বাংলা, পূর্ব বাংলা, উত্তর বাংলা, দক্ষিণ বাংলা - এই কথাগুলো যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেভাবে যদি 'ঈশান বাংলা' কথাটাকেও দেখা যায়, তবে এর অর্থ দাঁড়ায় - এই অঞ্চলটি বৃহত্তর বাংলার উত্তর-পূর্ব অংশ। কিন্তু এই অঞ্চলটি তো উত্তর-পূর্ব বাংলা নয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য অবাঙালির বাসিন্দারা এই অঞ্চলকে কখনোই 'ঈশান বাংলা' বলে মেনে নেবে না। কবি-প্রাবন্ধিক বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যও এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন -

"'ঈশান বাংলা' কথাটার গর্ভে যে আগুন জমা আছে তা নতুন বিপদ ডেকে আনতে পারে।"

সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বাস। সেই সঙ্গে বহু ভাষার সাহিত্যের চর্চা ও বিকাশ ও বাস্তব সত্য। আর তাই সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতকে বৃহত্তর বাংলার একটা ভৌগোলিক অংশ মনে করে 'ঈশান বাংলা' নামকরণ নিতান্তই অবান্তর ও অযৌক্তিক। যাইহোক, 'ঈশান বাংলা' কথাটি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ১৯৬১ সালের ১৯শে মে তারিখটির গুরুত্ব

ঐতিহাসিক। আর সেই সুনির্দিষ্ট তারিখে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে তরুণ তরুণীরা প্রাণ দিয়েছিলেন সেই শহীদদের স্মৃতির প্রতি এই কবিতাটি অমোঘ শ্রদ্ধার্ঘ্য হয়ে থাকবে।

উনিশে মে ১৯৬১-র স্মৃতি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর 'গদ্য সমগ্র' গ্রন্থে সংকলিত 'উনিশে মে-ও আমি' প্রবন্ধে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন কবি। এই প্রবন্ধটি প্রথম ২০০১ সালের ২০মে 'যুগশঙ্খ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি আমাদের আলোচ্য কবিতাটির ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাই প্রবন্ধটি উপস্থাপন করে এই আলোচনার সমাপ্তি করা হবে -

টিপ্পনী

## 'উনিশে মে ও আমি' ঃ

১৯শে মে, ১৯৬১। তখন আমার চাকুরি জীবন শুরু হয়ে গেছে। কলেজ-জীবন শেষ হয়নি। ১৯৫৮ সালে আই এস সি পাশ করার পর পরই শিলচরে একটা হাইস্কুলে মাস্টারি পেয়ে গেছি। আর, টিচার প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে বি.এ. পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এসে গেল উনিশে মে। আর কয়েকদিন পরেই ফাইনাল পরীক্ষা। সক্রিয় রাজনীতিতে কোনদিনই যুক্ত ছিলাম না। তবে রাজনীতি সম্পর্কে তারুণ্য-সুলভ একটা কৌতূহল তো ছিলই। সেই কৌতূহল বশেই মার্কসবাদের অনুরাগী হয়ে গেলাম। আমার সাহিত্য-চিন্তার সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তার একটা যোগও খুঁজে পেলাম। ফলে, মনে মনে আমি কমিউনিস্ট। তখন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দল বলতে একটিই দল ছিল। সিপিআই অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া। তখন শিলচরে কমিউনিস্ট পার্টির একটা অফিস ছিল। নাজিরপট্টিতে একটি ছোট্ট কাঠের দোতলায়। শ্রদ্ধেয় কমরেড গোপেন রায় সেই অফিসেই বসবাস করতেন। এই অফিসটিকে বলা যেতে পারে, ওয়ান-ম্যান-কমিউন। সকালে বিকেলে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অন্যান্য নেতৃবৃন্দও এই অফিসে আসতেন। অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, দিগেন দাশগুপ্ত, দ্বিজেন সেনগুপ্ত, মনি রায় প্রমুখ অনেকেই আসতেন। পার্টি অফিসে একটা বাংলা দৈনিক রাখা হত। স্বাধীনতা। অবশ্যই কমিউনিস্ট দলের মুখপত্র।

ওই অফিসে আমার যাতায়াত নিয়মিত ছিল না। সমবয়সী কমিউনিস্ট ভাবধারায় দীক্ষিত ছাত্রবন্ধু সঙ্গে থাকলেই যেতাম দু'জনের কথা খুব বেশি মনে পড়ছে। চিন্তাহরণ দাস ও অসিত আদিত্য। অসিত আমারই সঙ্গে জি সি কলেজে পড়ত। কিছুদিন দু'জনে একই বাসায় ছিলাম। ওরই মাধ্যমে তার আরেক বন্ধু চিন্তাহরণের সঙ্গে পরিচয় হল। দু'জনেই ছিল সাম্যবাদী চিন্তায় আমার চেয়ে অগ্রণী। ওরা দু'জনেই ছিল সাহিত্যের বোদ্ধা পাঠক এবং মুখর সমালোচক। চিন্তাহরণ ছিল আরও এক ধাপ এগিয়ে। তার মতো আমিই খুব কমই দেখেছি। মনে পড়ছে ১৯৫৯ সালে বাম নেতৃত্বে গঠিত কেরালা রাজ্য সরকার ভেঙে দেওয়ার ঘটনা। কেন্দ্রে তখন জওহরলাল নেহরুর কংগ্রেস সরকার। ইন্দিরা গান্ধী এআইসিসি-র প্রেসিডেন্ট। যথেষ্ট অনৈতিকভাবে লাল সরকারকে ভেঙে দেওয়া হল। কমিউনিস্টরা স্বভাবতই প্রতিবাদ মুখর হলেন। শিলচরেও প্রতিবাদ সভা হল। নাজিরপট্টি গোলদীঘির পাড়ে জনসভা। চিন্তাহরণ যে উত্তপ্ত ভাষণ দিয়েছিল তার তুলনা আমার অভিজ্ঞতায় বিরল। যাই হোক, কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব, প্রাসঙ্গিক বই-পত্র, চায়ের দোকানের আড্ডা এসবের মধ্যে থেকে কবিতা-রচনার অভ্যাস আর সাম্যবাদী চেতনায় সাবালক হতে থাকলাম। এর মধ্যেই ১৯৬১ সাল এসে গেল। আসাম বিধানসভায় (তখন শিলঙে) রাজ্য ভাষা বিল পাশ হল। এ রাজ্যের রাজ্যভাষা হবে একমাত্র

টিপ্পনী

অসমীয়া। অনঅসমীয়ার বিশেষ করে বাঙালিরা এটা মানতে পারলেন না। কিন্তু আসাম রাজ্যের বিধানসভায় অসমীয়াভাষীরাই সংখ্যাগুরু। সংখ্যাগুরুত্বের জোরে একমাত্র অসমীয়া রাজ্যভাষা হয়ে গেল। বাঙালিরা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হলেন। অসমীয়ার সঙ্গে বাংলাকেও রাজ্যভাষার মর্যাদা দিতে হবে – এই দাবি ক্রমশ সোচ্চার হতে লাগল। ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার বাঙালিরা তেমন গলা ঝেড়ে কাশতে পারলেন না। কিন্তু কাছাড়ের (বর্তমানে বরাক উপত্যকা) বাঙালিরা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন এই আন্দোলনের প্রথমদিকে কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থন ছিল না। সারা ভারতের মতো আসামেও তখন কংগ্রেস প্রধান দল। এই কংগ্রেসি সরকারই রাজ্য ভাষা বিল পাশ করেছে। বরাক উপত্যকার বাঙালি কংগ্রেসিদের কেউ কেউ ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হলেও রাজনৈতিকভাবে প্রকাশ্যে তেমন প্রতিবাদ করলেন না। ফলে কিছু দলছুট রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সামনে রেখে বাংলা ভাষা আন্দোলনের জন্য একটা সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা চলল। সংগঠনে কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তির নাম থাকলেও মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত সমাজের তরুণরাই ছিল মূল শক্তি। তখন একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত তরুণ কর্মীর নাম শোনা গেল। পরিতোষ পালচৌধুরী। এক উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান। দেশ ছাড়ার পর কিছুদিন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিভিন্ন স্থানে ভাগ্যান্বেষণে ব্যস্ত ছিলেন। পরে শিলচরে এসে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক হিসেবে কিছুটা পরিচিত হলেন। করিমগঞ্জের রথীন্দ্রনাথ সেন, হাইলাকান্দির হরিশ চক্রবর্তী সহ আরও কিছু রাজনৈতিক নেতার নাম শুনতে থাকলাম। ওঁরা বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতিকে সুদৃঢ় করতে থাকলেন। কিন্তু কোথাও যেন আন্দোলনের প্রস্তুতি তেমন জোরদার হচ্ছিল না। উনিশে মে তারিখে যে এমন একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে যাবে, তা অনেকেই অনুমান করতে পারেননি। তার একটি বিশেষ কারণও ছিল। আসামের রাজনীতিতে তখন কংগ্রেসই সর্বেসর্বা। বিরোধী দল হিসেবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পি.এস.পি.-র (প্রজা সোসিয়ালিস্ট পার্টি) একটু নামডাক ছিল। কম্যুনিস্টদের খ্যাতি ছিল, কিন্তু এই অঞ্চলে সংগঠন মোটেই জোরদার ছিল না। ১৯৬১ সালে বরাক উপত্যকার বহিরঙ্গ রাজনীতির এই ছিল অবস্থান। কিন্তু অন্তরঙ্গ রাজনীতি নির্ভর করে মানুষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতের উপর। বরাক উপত্যকার সমাজ নানা নামে বিভক্ত হলেও, মূলত দুটি অভিধা ছিল বহুল প্রচলিত। স্থানীয় আর রিফিউজি (উদ্বাস্তু), গ্রামাঞ্চলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যারা পুরুষাণুক্রমে বাস করে, তারা হলেন স্থানীয়। আর পূর্ববঙ্গাগত শহরাঞ্চলের অধিবাসীরা হলেন রিফিউজি। এই রিফিউজিদের এক ক্ষুদ্র অংশ বংশানুক্রমে বা ১৯৪৭ সালের অব্যবহিত আগে এলেও গ্রামাঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে তাদের নাড়ীর টান প্রায় ছিল না। অবশ্য এই চিত্র শুধু বরাকেরই নয়, গোটা দেশেই তো অল্প-বিস্তর একই চিত্র। তার কারণ বিশ্লেষণ করবেন সমাজ বিজ্ঞানীরা। আমি ওদিকে যাচ্ছি না। বরাক উপত্যকার জনজীবন সম্পর্কে আর একটি সত্যচিত্র হল হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক। বলা বাহুল্য, বিগত শতাব্দীতে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গালাগালি ও গলাগলি হয়েছে নানাভাবে। কিন্তু প্রকৃত বন্ধুত্বপূর্ণ মিলন ঘটেনি। ওরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হলেও হতে পারে, কিন্তু একই 'কুসুম'-এর দুটি পাপড়ি হতে পারেনি। বরাকের মত অনুন্নত অঞ্চলে, এই কুসুমগুলি ছিল কীটভর্তি। ফলে যা হবার তাই হল। উনিশে মে-র ভাষা আন্দোলনে শহরের মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত হিন্দুরা কিছুটা এগিয়ে এলেও মুসলিমরা নীরব ছিলেন।

আন্দোলনকারীদের তেমন কোনও রাজনৈতিক অভিভাবক ছিল না। কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদের স্বার্থের কারণে এবং কমিউনিস্ট নেতৃত্ব তাদের তত্ত্বের কারণে প্রায় নীরবই ছিল। ওইসব মহলে ফিসফাস যে কথাবার্তা শুনতাম তার সারাংশ হচ্ছে কাছাড় (বরাক) নানা ভাষা নানা সম্প্রদায়ে

বিভক্ত অঞ্চল, এখানে বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন করলে আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। এই বক্তব্য ছিল, মোটামুটিভাবে কংগ্রেস ও পি.এস.পি.-দের। ওদের কথাবার্তায় আর একটি নাম প্রায়ই উঠে আসত। মইনুল হক চৌধুরী। মইনুল হক চৌধুরীকে আমি তখনও চোখে দেখিনি। তিনি ছিলেন জালের আড়ালের রাজা। কংগ্রেসের নেতা এবং মুসলমান সমাজের একচ্ছত্র অধিপতি। স্বাধীনতার আগে মুসলিম লিগ রাজনীতি করতেন, পরে কংগ্রেসি, হিন্দু কংগ্রেসিরা বলতেন, ওকে বুঝে সমঝে চলতে হবে। উনি বাংলা ভাষা আন্দোলনে না এলে কেউ কিছু করতে পারবে না। অতএব ধর্মে আছি জিরাফেও আছি করে হিন্দু কংগ্রেসিরা ঝুলতে থাকলেন, আর কমিউনিস্টরা বলতেন, যে আন্দোলনের সঙ্গে (ভাষার আন্দোলন) শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থের যোগ নেই, সেই আন্দোলনে কমিউনিস্টরা যেতে পারে না। ভাষা আন্দোলন হচ্ছে, বুর্জোয়াদের ভাবাবেগের আন্দোলন। এতে অর্থনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। ভাষা আন্দোলনে যোগ দিলে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের বৃহত্তর শোষণমুক্তির আন্দোলন দুর্বল হবে। অতএব, এ-পথে হাঁটা চলবে না।

টিপ্পনী

এই অবস্থার মধ্যে একটি রীতিমত 'অ-ক্রিয় রাজনীতির' যুবক অর্থাৎ আমি, কমিউনিস্ট পার্টির কাঠের দোতলার অফিসে যাতায়াত করতে থাকলাম। যাওয়া আসার পথে দু-একটি মিছিল সমাবেশও চোখে পড়ত। আঠারো মে আন্দোলনকারীদের প্রচার সরগরম হল। উনিশে মে বন্‌ধ্। কোনও চাকাই চলবে না। রেলে চাকা বন্ধ করার জন্য সত্যাগ্রহীরা ভোর থেকেই রেল স্টেশনে জমায়েত হবেন। বড় রাস্তা থেকে অলিগলি সর্বত্রই মাইক বাজতে থাকল। আমি তরুণ বাঙালি। গায়ের রক্ত অবশ্যই একটু উষ্ণ হয়েছিল। কিন্তু এ তো বুর্জোয়া ভাবাবেগের আন্দোলন। গায়ের রক্ত উষ্ণ হলে চলবে না। তখন বিশ্বাস করতাম রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি। গজদন্তমিনারে বসে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর ভাষা এবং ভাবনার সঙ্গে জনগণের ভাষা-ভাবনার কোনও সংযোগ নেই। কাজেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো কমিউনিস্টদের চলবে না। সে যুগে মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচক হিসেবে নীরেন রায়ের খুব নাম-ডাক। সেই গোষ্ঠীর সমালোচকরা বলতেন, রবীন্দ্রনাথের গোরা, ঘরে বাইরে প্রভৃতি উপন্যাস অপেক্ষা গোলাম কুদ্দুসের মরিয়ম, বাঁদী প্রভৃতি উপন্যাস উৎকৃষ্ট। কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা সুকান্ত ভট্টাচার্য অনেক বড়। বুদ্ধিমান পাঠকরা মানিক পড়তে পারেন, বিষ্ণু দে পড়তে পারেন, কিন্তু বঙ্কিম, শরৎ, বিভূতিভূষণের সাহিত্য তো সাম্প্রদায়িক আর প্রতিক্রিয়াশীল। আর জীবনানন্দ? অবক্ষয়ের কবি, Poet of decadence। যে-সময়ের কথা বলছি সে-সময়ে পরিচয় পত্রিকার সম্পাদনা সুধীন দত্তের হাত থেকে গোপাল হালদারের হাতে চলে গেছে। আর আমি তখন পরিচয় পত্রিকা খুব পড়তাম।

যাই হোক, উনিশে মে'র সকালবেলা অসিত আদিত্য ও আমি একসঙ্গে শিলচর রেলস্টেশনে গেলাম। রেললাইনের ওপরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সত্যাগ্রহীরা বসে পড়েছেন। কোথাও লড়াকু ভাব দেখলাম না। গান্ধীজির অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনেরই প্রতিচ্ছায়া যেন, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আন্দোলন প্রতিরোধকারীদের (পুলিশ, সিআরপি) গল্পগুজব হাসি-মস্করাও চলছে। ঘুরতে ঘুরতে মনে হল, দিনটি ভালোয় ভালোয়ই কাটবে। দুপুর একটা নাগাদ বাসায় ফিরে এলাম। তিনটা নাগাদ শুনলাম রেলস্টেশনে শহিদের রক্তে লাল হয়ে গেছে। শত শত সত্যাগ্রহী গুলিতে মারা গেছেন। আহত হয়েছেন সহস্রাধক লোক। আমার আত্মীয় ভদ্রলোক (তাঁর বাড়িতেই আমি থাকতাম) একটু ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। তাঁর ছেলেও গিয়েছিল স্টেশনে। ও কি বেঁচে আছে? ওঁর চেহারায় অনুক্ত জিজ্ঞাসা পড়লাম। ছুটে গেলাম সিভিল

হাসপাতালে। কাতারে কাতারে লোক জমা হয়েছে। কেউ সঠিক কিছু বলতে পারছে না। অনেকেই এসেছে আপনজনদের খোঁজ নিতে। হাসপাতালের ঘরে ঢুকে দেখলাম কিছু দেহ মেঝের ওপর সাদা কাপড়ে আচ্ছাদিত। একজন সাহস করে শবদেহগুলোর মুখ আচ্ছাদন সরিয়ে দেখছেন। আমরাও হুমড়ি খেয়ে এক ঝলক দেখে নিলাম। না, যাকে খুঁজতে এসেছি তাকে দেখতে পেলাম না একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। পর পর দু'তিনটি মুখ দেখার পর আরেকটি মুখের আচ্ছাদন সরানো হচ্ছে। ঠিক ওই সময়ে পেছন থেকে একজন লোক আচ্ছাদন সরাতে ইঙ্গিতে নিষেধ করছেন। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন একজন মহিলা কমলা'র খোঁজ নিতে এসেছেন। ভদ্রলোকের ইঙ্গিত বুঝতে না পেরেই আচ্ছাদন সরিয়ে ফেলা হল। আর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পাশে দাঁড়ানো মহিলাটি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পরে জেনেছিলাম শহিদের নাম কমলা ভট্টাচার্য।

টিপ্পনী

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেও জানতে পারলাম না ঠিক কতজন শহিদ হয়েছেন। তবে ইতিমধ্যে কয়েকজনের নাম জানলাম। শহিদ শচীন্দ্র পাল, কাছাড় হাইস্কুলে আমার ছাত্র ছিল। পানপট্টির মতি পালও ছিল ছাত্র। তার পেটে গুলি বিঁধেছিল। পরে, শুশ্রূষায় ভাল হয়ে ওঠে। আহত-নিহত সকলেরই নাম জেনেছিলাম দু'একদিন পরে। গুলির আদেশ কে দিয়েছিলেন তা আমরা এখনও জানি না। ঘটনা ঘটে যাবার পর মহীতোষ পুরকায়স্থ, নন্দকিশোর সিংহ, সতীন্দ্রমোহন দেব, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য মহাশয়দের যথোচিত সদর্থক ভূমিকার কথা জানি। কিন্তু আজও জানি না উনিশে মে'র ঠিক একমাত্র পর হাইলাকান্দিতে বাংলা ভাষা বিরোধী আন্দোলন হল কেন গোটা রাজ্যের হোক, অন্তত বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার ব্যবহারের অধিকার পেয়েও আমরা কেন রক্ষা করতে পারছি না, আজও জানি না। কিংবা হয়ত সবই জানি। কিন্তু তার জন্য স্বতন্ত্র অবকাশের দরকার, প্রয়োজনে বিতর্কও।

## অমিতাভ দেব চৌধুরী ঃ

বরাক উপত্যকার কবি অমিতাভ দেব চৌধুরী জন্ম ১৯৬২ সালে। শিলং এবং যাদবপুরে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। বর্তমানে তিনি উধারবন্ধে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলি হলো 'অমিতাভ দেব চৌধুরীর কবিতা' (২০০৬), 'ঈশ্বরের শেষ গুপ্তচর'(২০০৯), 'চাঁদের ফ্রেসকো' (২০১১) এবং 'স্বপ্নসুমারি- 'The Census of Dreams' (২০১১)।

উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বাংলা সাহিত্যের মূল ধারাকে সমৃদ্ধ করলেও স্থানিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা স্বাতন্ত্র্য দাবি করে। কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতে বরাক উপত্যকা বিশেষ একটা জায়গা করে নিয়েছে। এই কাব্য আন্দোলনের পেছনে এই অঞ্চলের মানুষের বাংলা ভাষাকে নিয়ে যে আবেগ তাকেই দায়ী করা যায়। আর তাই 'অতন্দ্র'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল -

"কেউ পঞ্চাশের কবি কেউ ষাটের কবি, আমরা পঞ্চাশেরও নই, ষাটেরও নই, আমরা কাছাড়ের কবি।"

বৃহত্তর বাঙালি পাঠককুলের কাছে পৌঁছে যাবার লক্ষ্যে বরাক অঞ্চলে লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে কাব্যচর্চা বিস্তার লাভ করেছে। ত্রিপুরা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা কবিতার প্রসার ঘটলেও বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ও তরুণ-তরুণীর শহীদ হওয়ার

ঘটনা একটা স্বতন্ত্র আবেগের জন্ম দিয়েছে। আর তাই সেখানকার সাহিত্যচর্চায় ঘুরে ফিরে এসেছে ১৯৬১-র ১৯ মে'র স্মৃতি। বরাক উপত্যকার প্রতি এক স্বতন্ত্র ভাবাবেগেরও জন্ম হয়েছে। আমাদের আলোচ্য অমিতাভ দেব চৌধুরীর কবিতাটিও বরাক উপত্যকাকে কেন্দ্র করেই রচিত।

টিপ্পনী

### বরাকভ্যালি এক্সপ্রেস

যে ট্রেন যায়নি কোনোদিন, আমি তার যাত্রী ছিলাম।
বিদায় চুম্বনগুলি, দেশের ভিটের বাস্তুসাপটির মতো
কিংবদন্তিজন্ম ফিরে পেল।
অবাক অপেক্ষাগুলি খুর ঠুকে ঠুকে রাজপথে নামাল গোধূলি।

তারপর কত ট্রেন গেল, এল। কত কত কামরার ঘুম
বাক্যহারা স্টেশনে ফুরোল।
তবু সেই না-যাওয়ার স্বপ্নভ্রষ্ট ছায়া, পরবর্তী প্রতিটি যাওয়ায়,
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল যে কেবল।

আমার সকল যাওয়া সেই না-যাওয়ার ভারে
আজীবন ফেরা হয়ে ওঠে।
আমাদের সব থাকা সেই না-যাওয়ার ভারে
সড়কের পাশে, সস্তা হোটেল খোঁজে
পরিত্রাণ, মূল স্রোত, ললাটলিখন।

যাওয়া-না-যাওয়ার মাঝখানে,
একটি অচল সেতু কারাগার হয়ে ওঠে ক্রমে।

যে ট্রেন যাবে না কোনোদিন, আমরা তার যাত্রী ছিলাম।

কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ - এই তিন জেলা নিয়ে গঠিত বরাক উপত্যকা। এই অঞ্চলটির ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক মানচিত্র আসাম হলেও এর আত্মিক সম্পর্ক বরাবরই বৃহৎবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। কবির মতে,

"এই অনুরাগ বা আসক্তি বরাক উপত্যকার বাঙালি-মানসকে তার বাস্তবের গৃহ থেকে চিরকালীন এক দূরত্বে প্রোথিত ক'রে, তাকে এক ভাবলোকের গৃহাভিমুখী ক'রে তুলেছে।"

'বরাকভ্যালি এক্সপ্রেস' কবিতাটিতে কবির এই 'ভাবলোকের গৃহাভিমুখী' মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এক সময় বরাকের বাঙালিরা কোলকাতার সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে ব্যাঙ্গালুরু বা নিউইয়র্কের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য প্রদেশের বাঙালিরা নিজস্ব ভুবনের বাইরে সেভাবে পা না রাখলেও বরাক উপত্যকার বাঙালিরা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক আগে থেকেই। নিজ বাসস্থান ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়া এবং গৃহবিমুখতার পেছনে অন্যতম কারণ হয়তো অর্থনৈতিক বৈষম্য।

অশোকবিজয় রাহা, অমিতাভ চৌধুরী, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, করুণাসিন্ধু দে, ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার,

টিপ্পনী

উদয়ন ঘোষ, রুচিরা শ্যাম, রণজিৎ দাশ, মনোতোষ চক্রবর্তী, তীর্থংকর দাশ পুরকায়স্থ, দেবাশিস তরফদার, পার্থপ্রতিম মৈত্র, স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্য, সপ্তর্ষি বিশ্বাস, নীলাঞ্জন সরকার – এঁরা সকলেই জীবিকার প্রয়োজনে কখনো বা বৃহত্তর প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠালাভের আশায় বরাক উপত্যকা ছেড়ে বাইরের জগতে পা রেখেছেন ভৌগোলিক ব্যবধান সত্ত্বেও এঁরা বরাকের কবি হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছেন। আবার বরাকের এমন অনেক কবি রয়েছেন যাঁরা পশ্চিম কিংবা উত্তরবঙ্গ থেকে এই অঞ্চলে এসে পাকাপাকিভাবে থেকে গেছেন। যেমন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, বিকাশ সরকার, সমর দেব, অভিজিৎ চক্রবর্তী, তুষারকান্তি সাহা প্রমুখ। যাইহোক, বরাকের বাংলা কবিতা কিংবা সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে বাইরের ভুবনে নিজস্ব ছাপ তৈরি করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট কবি-প্রাবন্ধিকের চিন্তায়ও এই মনোভাবের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

"এ অঞ্চলের বাংলা সাহিত্য চর্চা যদি বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যে উপযুক্ত মর্যদা পায় তবে এ অঞ্চলের বাঙালির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা সম্ভব হবে না।"

যদিও আক্ষেপের বিষয় বরাক উপত্যকার বাংলাসাহিত্য চিরকাল প্রান্তীয় সাহিত্যধারা হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে নিজেদের প্রান্তীয় পরিচয় খোঁজার তাড়না এই অঞ্চলের কবিদের ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে ভূগোল-চেতনা সম্পর্কেও অভিজ্ঞ করে তুলেছিল। আমাদের আলোচ্য কবিতাটিতে কবির বরাকউপত্যকা সম্পর্কে নিজস্ব ভাবনা ও অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে-

"আমার সকল যাওয়া সেই না-যাওয়ার ভারে
আজীবন ফেরা হয়ে ওঠে।"

সাহিত্য স্থান-কাল নিরপেক্ষ নয়। আর তাই একই সময়ে লিখিত সাহিত্য হয়েও বরাক উপত্যকার কবিদের কবিতায় স্থানিক বৈশিষ্ট্য কবিতাগুলিকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে। বিশ্বায়নের যুগে এই অঞ্চলের কবিরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকলেও তাঁদের রচনা বরাক উপত্যকাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে সহায়ক হবে। অমিতাভের এই কবিতাটির ভাবনার প্রতিফলন তাঁর অন্য একটি লেখাতেও লক্ষ্য করা যায় –

"কে জানে, উজ্জ্বলতর জীবনের খোঁজে যাঁরা বরাক উপত্যকা ছেড়ে চ'লে গেছেন, একদিন হয়তো তাঁরা তাঁদের নিজেদের কবিতা ও আখ্যান লিখবেন এই উপত্যকাকে নিয়ে! এখানে যাঁরা রয়ে গেছেন তাঁরা তো তাঁদের আখ্যান আর কবিতা লিখে চলেইছেন। যদি কখনও এই দু'ধরনের আখ্যান এক জায়গায় এসে মিলিত হয়, তখনই হয়তো আমাদের পূর্বপুরুষদের এক নতুন দেশের সন্ধান ও ফেলে-আসা-দেশের স্মৃতিকাতরতা – সব মিলেমিশে জন্ম নেবে এক নতুন সাহিত্যের দিগন্ত।"

## বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য ঃ

পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য সাহিত্যের জগতেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, উপন্যাস, সাহিত্যের এইসব শাখায় তাঁর পদচারণা। লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক হিসেবেও তিনি সমধিক পরিচিত। বিজিৎকুমারের জন্ম ১৯৩৯ সালের ৩ অক্টোবর আসামের করিমগঞ্জ জেলার কায়স্থগ্রামে। ১৯৬৬ সালে হাইলাকান্দি এস.এস. কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা শুরু। এই বিভাগের প্রধান পদ থেকে অবসর গ্রহণ ২০০২

সালে।

**সম্পাদিত পত্রিকা ঃ** তরুণ, মুরুজ, মৌসুমীরাগ, সাহিত্য প্রভৃতি।

**কাব্যগ্রন্থ ঃ** কেউ পরবাসী নয়
জেগে আছে স্তব্ধতায়
সুন্দর সেখানে খেলা করে
মহাভারত কথা
পুনর্ভবা
ও ছেলে বাউল ছেলে
ভালো আছি সকলের সঙ্গে ভালো আছি

**স্মৃতিকথা ঃ** বিকেলের আলো
দিনান্তের বৈঠক

**উপন্যাস ঃ** পটভূমি

**প্রবন্ধ ঃ** সুরক্ষিত বন্দিশালা
বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন
উত্তরপূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য ১ম খন্ড, ২য় খন্ড, ৩য় খন্ড
সাহিত্যের সাতকাহন।

এছাড়াও সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ, সম্পাদিত্য গদ্যগ্রন্থ ও সম্পাদিত গল্পগ্রন্থ রয়েছে।

## বরাকভূমির লোক এভাবেই চলে

**বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য**

মেয়েটা পেরিয়ে গেল এবং ছেলেটা
হাত ধরাধরি করে
না ঠিক হাত ধরে নয়
এক হাতে জুতো ব্যাগ, অন্য হাতে প্রাণ
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বি. আর. টি. এফ–এর জোয়ানরা

নীচে নদী লোভা, খরস্রোতা, পাড়ে ধস
পাহাড়ে, ধসের দুদিকে গাড়ি, কিছু প্রাণ
তবু হাতে প্রাণ নিয়ে জুতো ব্যাগ নিয়ে ওদের পেরোতে হয়
জীবনের সব কাজ ভীষণ জরুরি আজকাল।
এদিকে একটি গাড়ি ছেড়ে ওদিকে অন্য গাড়ি ভাড়া নেয়
বরাকভূমির লোক এভাবেই চলে ছয় মাস, কখনো
আটকে পড়ে, রেল সড়ক কিংবা আকাশপথ
সব বন্ধ হয়ে যায় – তবু সমস্ত দেশের সঙ্গে
কীভাবে যে ঝুলে আছি তাই ভাবি

টিপ্পনী

মেয়েটা পেরিয়ে গেল এবং ছেলেটা
ধস পাড়ি দেয়, নদী লোভা কলকল হাসে।
দুই পাহাড়ের খাঁজে, তার জিভ লকলক করে
অদৃশ্য সুতোটি ধরে ওরা তো পেরোল দেখি ধস।

টিপ্পনী

বরাক অঞ্চলের প্রাত্যহিক জীবন-সমস্যার এক খন্ড চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন কবি, এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে। 'উত্তরপূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য' (১ম খন্ড) গ্রন্থে বিজিৎকুমার সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে উত্তরপূর্বাঞ্চলের অবস্থানের কথা বিচার করতে গিয়ে বলেছিলেন, এই অঞ্চলটি ভারতবর্ষের বাকি অংশের সঙ্গে এক ক্ষীণ সুতো দিয়ে বাঁধা রয়েছে। ভৌগোলিক অঞ্চলগত যে অসুবিধে বরাকভূমিকে ভোগ করতে হয়, তার প্রতি যে উপেক্ষা রয়েছে তা কবির সংবেদনশীল হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এত প্রযুক্তির সুবিধে থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের মানুষকে নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খরস্রোতা লোভা নদী পেরিয়ে যেতে হয়। জুতো, ব্যাগ হাতে নিয়ে শুধু নয়, এই বিপদশঙ্কুল যাত্রাপথে প্রাণ হাতে নিয়েও মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। সাহায্যের জন্য বি.আর.টি.এফ-এর জোয়ানরা সবসময় হাজির থাকে।

বিপদশঙ্কুল এই যাত্রাপথে একদিকে রয়েছে খরস্রোতা লোভা নদী, অন্যদিকে পাহাড়ের পারে ধস। ধসের দুদিকে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষ ধসের একদিকে গাড়ি থেকে নেমে ধসের অপরদিকে গিয়ে অন্য গাড়ি ভাড়া নেয়। অনেকসময় রেল, সড়ক, আকাশপথ সব বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বরাকভূমির লোক এভাবেই জীবন যাপন করে। কবি বিস্ময় প্রকাশ করেন দেশের বাকি অংশের সঙ্গে এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কীভাবে এই অঞ্চল সংযুক্ত হয়ে থাকে ঃ

"তবু সমস্ত দেশের সঙ্গে
কীভাবে যে ঝুলে আছি তাই ভাবি।"

কবিতাটি শেষ স্তবকে একটি মেয়ে ও একটি ছেলের ধস পাড়ি দেওয়া দেখে লোভা নদী 'কলকল হাসে', তার 'জিভ লকলক করে'। তা সত্ত্বেও এক অদৃশ্য শক্তিবলে মানুষ সব প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে এগিয়ে চলে। লোভা নদীর ওপর প্রাণের ধর্ম আরোপ করে সমাসোক্তি অলংকারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কবি।

## দ্বিতীয় একক

## উত্তর-পূর্বের প্রবন্ধ

# দেশভাগের অলিখিত উপন্যাস
## সুজিৎ চৌধুরী

টিপ্পনী

সুজিৎ চৌধুরীর এই প্রবন্ধটি করিমগঞ্জের 'ঋত্বিজ সাময়িকীর'র ২০০৫ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'দেশভাগ ও বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থে ও প্রবন্ধটি সংকলিত হয়। প্রবন্ধটির শিরোনামেই এর বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাস রচনায় বিভিন্ন সময়ে নানা সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেলেও 'দেশভাগ' নিয়ে সমকালের প্রথিতযশা লেখকদের মধ্যে একধরনের নির্লিপ্তি লক্ষ করা যায়। প্রাবন্ধিক এই নির্লিপ্তির- ই কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন এই প্রবন্ধে। আর এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে এসেছে সমকালীন রাজনৈতিক তথ্য ও সৃজনশীল সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ। এই দুটি বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধের সূচনাতেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন ঃ

''এ আলোচনায় রাজনৈতিক তথ্য যা থাকবে, তার সূত্র মোটামুটি যাচাই করা, তবে সৃজনশীল সাহিত্যের প্রসঙ্গে যে কথাগুলো আসবে, তার পুরোটাই স্মৃতিনির্ভর।''

১৯৪৭ সালে প্রাবন্ধিক সুজিৎ চৌধুরী যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়েন তখন যে গুটিকয় সাহিত্য রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেগুলি হলো দেব সাহিত্য কুটির-এর পূজাবার্ষিকী 'রাঙারাখী'-তে প্রকাশিত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি দীর্ঘ কবিতা- যাতে পূর্ববাংলা আলাদা হয়ে যাওয়ার জন্য বেদনার প্রকাশ ছিল, অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'তেলের শিশি ভাঙলো বলে...' বিখ্যাত ছড়া, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর সাম্প্রদায়িক বার্তা যুক্ত একটি গল্প এবং মনোজ বসুর 'মুখস্থ বক্তৃতা' নামে দু'পৃষ্ঠার একটি গল্প। এই লেখাগুলি মূলত দেশভাগ বিষয়ক। এগুলির মধ্যে মনোজ বসুর 'মুখস্থ বক্তৃতা' গল্পটি তাঁর মনে বিশেষ ভাবে দাগ কেটেছিল। দেব সাহিত্য কুটিরের অনুসরণে ১৯৪৭ সালেই শরৎ সাহিত্য ভবন থেকে ছোটোদের পূজাবার্ষিকী 'কাকলি' বেরিয়েছিল। এই সংকলনে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প 'আচার্য কৃপালিনী'- তে দেশভাগের প্রসঙ্গ এসেছে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভেদ-বিভেদ'-এও এই গল্পটি স্থান পেয়েছে। এছাড়া দেশভাগের বছরখানেক পর প্রবোধ স্যান্যালের 'হাসুবালু' উপন্যাসটি তৎকালীন সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। দেশ বিভাগকে কেন্দ্র করে রচিত এটাই ছিল কোনো প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিকের প্রথম বাংলা উপন্যাস। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত প্রতিভা বসুর উপন্যাস 'সমুদ্র হৃদয়'- এর পটভূমি মুখ্যত ঢাকা এবং প্লটের কেন্দ্রবিন্দুতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থাকলেও এর সমস্যা মূলত ব্যক্তিগত। হিন্দু প্রেমিকা ও মুসলমান প্রেমিকের প্রেম ও সমস্যা এই উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে - দেশভাগ গৌণ। এই হলো মোটামুটিভাবে সমকালে রচিত দেশভাগকে বিষয় হিসেবে নিয়ে লেখা সাহিত্যকর্ম।

পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে যাঁদের লেখায় দেশভাগ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে স্থান

টিপ্পনী

করে নিয়েছে তাঁরা ও তাঁদের উপন্যাসগুলি হলো অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড়- শ্রীখন্ড', প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা', গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ' পূর্ব-পশ্চিম', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' প্রভৃতি। এছাড়া স্বাধীনতার অর্ধশত বৎসর পরে লিখিত শান্তা সেন- এর 'পিতামহী' তে দেশভাগের সময়ের অনন্য সাধারণ বিবরণ রয়েছে। প্রাবন্ধিক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, দেশভাগের সময়ে যে সকল প্রতিশ্রুতি বলে কথাসিল্পী ছিলেন তাঁরা অদ্ভুতভাবে এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থেকেছেন। তাঁদের লেখায় দেশভাগ যেভাবেজায়গা করে নিতে পারে নি। পাশাপাশি এই আক্ষেপও প্রকাশ করেছেন যে-

''সংবেদনশীল বলে পরিচিত বাঙালি কথাশিল্পীদের এই সার্বিক নিরাসক্তির কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা তেমন একটা হয় নি।''

প্রাবন্ধিক এই নির্লিপ্তির কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। এই সব লেখকরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, আগষ্ট আন্দোলন, মন্বন্তর প্রভৃতি সমকালীন বিষয়কে নিয়ে লিখলেও দেশভাগ গুরুত্ব পায় নি। আবার এই লেখকগণ স্বাধীনতার পরেও দীর্ঘ সময় জীবিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের লেখায় দেশভাগ উপজীব্য হয়ে দেখা দেয়নি। আর তাই এর কারণ সন্ধান করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন ঃ

''ওই সময়কার উত্তাল রাজনৈতিক তরঙ্গ বিক্ষোভ বাঙালি হিন্দুর অগ্রণী অংশকে নতুন কোনও রাজনৈতিক অন্বিষ্টের সন্ধানে প্রণোদিত করেছিল আর সেই লক্ষ্য সন্ধান এতটাই একমুখী ছিল যে অন্য সবধরনের সংবেগকে তা অসাড় করে দিয়েছিল।''

পূর্ববঙ্গের বিযুক্তি শুধুমাত্র বাঙালি হিন্দু নেতৃত্বের কাছেই 'রাহুমুক্তি' বলে মনে হয় নি, পাশাপাশি বাঙালি হিন্দু সাহিত্যিকরাও এই মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আর তাই সাহিত্য রচনায় দেশভাগ বিষয়টি তাঁরা সযত্নে পরিহার করেছেন। বাঙালি হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও বাঙালি হিন্দু সাহিত্যিকদের এই ধরনের মানস গঠনের নেপথ্যে যে রাজনৈতিক পটভূমি দায়ী তাও প্রাবন্ধিক প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরেছেন।

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এন্টলি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাছে লিখিত এক চিঠিতে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে দেশভাগকে সরাসরি যুক্ত করার প্রস্তাব দেন। ৬ মার্চের সভায় এই প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু দেশভাগের প্রেক্ষিতে বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। মুসলিম লিগ প্রথম থেকেই সমগ্র বাংলার পাকিস্তান- ভুক্তির দাবিতে সোচ্চার ছিল। কিন্তু এর বিরপীতে দুটো নতুন প্রস্তাব নিয়ে বিচার- বিবেচনা চলতে থাকে। প্রথমটি হলো ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে একটি সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করা। দ্বিতীয়টি বাংলার পশ্চিম অংশের হিন্দু সংখ্যাধিক্য বিশিষ্ট অঞ্চলগুলি নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরেই পশ্চিমবঙ্গ নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ তৈরী করা।

বাংলার তৎকালীন মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হাসান শহিদ সুরাবর্দি কয়েকজন লিগ নেতাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলার অখন্ডতা রক্ষার জন্য সার্বভৌম বাংলার দাবি তুলেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন প্রাদেশিক মুসলিম লিগের অন্যতম সম্পাদক আবুল হাসিম

আর বগুরার মহম্মদ আলি। প্রথম দিকে বাংলার কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও কিরণশঙ্কর রায় এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে গান্ধিজি ও লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু মতভেদের ফলে তাঁরা এই প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়ান। এরপর সুরাবর্দি শরৎচন্দ্র বসুর সম্মতি আদায় করেন। শরৎচন্দ্র সুরাবর্দিকে নিয়ে গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করে এই প্রস্তাবের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। গান্ধিজি কিন্তু প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে দেন। পরে শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখে জানান ঃ

" I have now discussed the scheme roughly with Pandit Nehru and the Sardar. Both of them are dead against the proposal."

টিপ্পনী

অন্যদিকে সুরাবর্দি মুসলিম লিগকে দিয়েও প্রস্তাবটি গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হন।

সার্বভৌম যুক্তবঙ্গের প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি না পাওয়ার জন্য মূলত দায়ী ছিলেন সুরাবর্দি। কারণ সুরাবর্দিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক বা প্রবক্তা হিসাবে কেউই গ্রহণ করতে চায় নি। একমাত্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই, ভাষা ও সংস্কৃতিকে সামনে রেখেই এই দাবি গ্রহণীয় হতে পারে। গান্ধিজিও তাই মনে করতেন, আবুল হাসেম গান্ধিজিকে এই কথাই বলেছিলেন। মুসলিম লিগ কিন্তু ভাষাগত জাতীয়তাবাদকে সমর্থন জানায় নি।

**প্যারোলাল লিখেছেন ঃ**

" Gandhiji was happy to learn from Mr. Hashem that his case for a united Bengal was on the grounds of common language, common culture, and common history that united the hindus and muslims of bengali."

অন্যদিকে বাঙালি হিন্দুর কাছে সুরাবর্দির বিশ্বাসযোগ্যতা একেবারেই ছিল না। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের নামে যে বীভৎস দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল এবং তাতে সুরাবর্দির সরাসরি সমর্থনকে কেউ সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। এই দাঙ্গায় খুন হয়েছিল ৪৪০০ মানুষ, আহত হন ১৬০০০ এবং নিরাশয় হন ১০০০০ জন। সুরাবর্দির সমর্থক ব্রিটিশ প্রেস এই দাঙ্গার নাম দিয়েছিল "The Great Calcutta Killing"। এছাড়া নোয়াখালিতে দীর্ঘস্থায়ী দাঙ্গার নেপথ্যে ছিলেন সুরাবর্দি।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে হেমন্তকুমার সরকারের একটি ধারাবাহিক আলোচনা দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে তখনই প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম তোলা হয়। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে এই প্রস্তাবের সমর্থনে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটি, West Bengal Provincial Committee, জাতীয় বঙ্গ সংস্থাপন সংগঠন কমিটি, হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটি, পাটনার Bengal Partition League,বর্ধমানের Hindu Minorities Protection League, The West & North Bengal Union প্রভৃতি ছোটো-বড়ো সংগঠন ও সমিতিগুলির মধ্য দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের আন্দোলন বিপুল জনসমর্থন আদায় করে নেয়। বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি পশ্চিমবঙ্গকে আলাদা করে নেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাইরে থেকে এই দাবিকে জোরালো সমর্থন জানান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধায়। বাংলার সংবাদপত্রগুলো প্রথমে বাংলা বিভাজনের ব্যাপারে সহমত পোষণ না করলেও পরে এগুলোর সমর্থন পাওয়া যেতে থাকে। দৈনিক বসুমতী প্রথম থেকেই বঙ্গভঙ্গের সমর্থক ছিল। পরে যে

সংবাদপত্রগুলো জোরালো সমর্থন জানিয়েছিল সেগুলো হলো Modern Review, প্রবাসী, দৈনিক যুগান্তর, Amritbazar Patrika, আনন্দবাজার ও Hindustan Standard

বাংলার জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় আইন পরিজনদের ১১ জন সভ্য ১১ এপ্রিল, ১৯৪৭ সালে ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে পশ্চিমবঙ্গেকে ভারত ইউনিয়নের একটি নতুন প্রদেশ রূপে গঠন করার দাবি জানান। এর ফলে বিভিন্ন আন্দোলন আরো শক্তি সঞ্চয় করে। শেষে ১০ ও ১১ মে তারিখে জাতীয় বঙ্গ মহাসম্মেলনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার ৫৬ জন সভ্য এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান। সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাবে বলা হয়, যে অংশগুলো হিন্দুপ্রধান সেগুলোকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠন করা হোক। বাংলা বিভাজনের জন্য শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু নেতৃত্বই আগ্রহী ছিল তা নয়। পূর্ববঙ্গের অনেক হিন্দু নেতা ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র বাংলার হিন্দু নেতৃত্বই বাংলার বিভাজনকে শ্রেষ্ঠ পথ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। সার্বভৌম–অখন্ড বাংলার প্রস্তাবক যাঁরা ছিলেন তাঁরা তত্ত্বগতভাবে হলেও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার কথা উত্থাপন করেছিলেন। বাংলা বিভাজনের প্রস্তাবকরা কিন্তু অখন্ড বাংলার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এই বিরোধিতার সঙ্গত কারণ থাকলেও প্রাবন্ধিকের কাছে তা বিস্ময়কর মনে হয়েছে। তিনি জানিয়েছেনঃ

টিপ্পনী

''সেটা একটা বিপন্ন সময়, পারস্পরিক আস্থাহীনতার শিকড় তখন বহু গভীরে পৌঁছে গেছে। তবুও বাঙালি জাতিসত্তার ভাষিক বাঙালি হিন্দুর কোনও অংশের কাছেই আদৌ বিবেচনাযোগ্য বলে মনে হলো না, এ তথ্যটি কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর ঠেকে।''

বাঙালি হিন্দুর রাজনৈতিক বোধের মধ্যে পূর্ববঙ্গ কখনোই গুরুত্ব পায় নি। পূর্ববঙ্গকে বাদ দিয়ে তাঁরা নিজস্ব ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এই বোধ বা মানসিকতা বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যেও দুর্লক্ষ নয়। প্রাবন্ধিক কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত কণ্যাকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর চিঠিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারতীয় বাঙালির আবেগের বিরুদ্ধে বিরক্তি ও উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরিতে পাওয়া যায় যে, নোয়াখালিতে বাঙালি হিন্দু নিগ্রহের প্রতিক্রিয়ায় বিহারের হিন্দুরাই বাঙালি হিন্দুর যথার্থ বন্ধু বলে তিনি মনে করেছেন। ১৯৮৭ সালের ২৫ জুন একটি চিঠিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন ঃ

''নতুন বঙ্গ ভাগ হয়ে গেল ভালোই হ'ল। বাঙালী হিন্দুরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। আমাদের ভয় নেই, হিন্দুস্থান, পাকিস্তান দুজায়গাতেই বাড়ী আছে।''

কলকাতা যদি হিন্দুদের না থাকে তাহলে সাহিত্য ও কৃষ্টির সর্বনাশ হয়ে যাবে এবং বাঙালি কালচার নষ্ট হয়ে যাবে বলে তিনি মনে করতেন। যে সকল বাঙালি হিন্দুর বাড়িঘর বিভাজনের পর পাকিস্তানে পড়েছিল তাদের বাধ্যতামূলক বাস্তুত্যাগ বিভূতিভূষণের সংবেদনশীল মনে তেমনভাবে রেখাপাত করে নি। আর তাই ২ জুলাই, ১৯৫০ সালে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন ঃ

''অপূর্ব রূপ ইছামতীর দুই পারের। তবে পাকিস্তানিদের ভিড়ে দেশের গ্রাম্য সৌন্দর্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গাছপালা কেটে সাবাড় করে দিয়েছে।''

কাজেই দেখা যাচ্ছে ১৯৪৭ সালের শুরু থেকেই বাঙালি হিন্দুর অগ্রণী অংশ একটি মাত্র

লক্ষ্যকেই চূড়ান্ত বলে নির্বাচন করেছিলেন। কোলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানি গ্রাস থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যের কাছে বাকি সব চিন্তাভাবনা গৌণ হয়ে গিয়েছিলেন। বাংলার সাহিত্যিকরাও একমুখী ওই লক্ষ্যের দ্বারা সার্বিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সঙ্গত কারণেই প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেছেন ঃ

''পূর্ববঙ্গের বিযুক্তি তাই তাঁদের কাছে একটা স্বস্তির ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল, বেদনা বা আর্তির কোনও ভেজাল তার সঙ্গে মেশেনি। তাই শতাব্দির সবচাইতে মর্মান্তিক জাতীয় বিপর্যয় বাংলা সাহিত্যে অকথিত হয়েই রইল আর বিস্ময়কর সেই মৌনতার কারণ অনুসন্ধানের কাজটা পর্যন্ত কারও কাছে জরুরি বলে মনে হল না।''

টিপ্পনী

## চর্যাপদ, কৃষ্ণকথা ও মঙ্গলকাব্য ঃ অনালোকিত প্রেক্ষিত
## সুজিৎ চৌধুরী

আমাদের আলোচ্য এই প্রবন্ধটি যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য জন্ম শতবর্ষের অনুষ্ঠানে ফ্যাকাল্টি হাউস, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ১১ আগস্ট, ২০০৪-এ সুজিৎ চৌধুরী প্রদত্ত ভাষণ। পরে লেখকের 'সমাজ ও সাহিত্যে ঃ ছিন্ন চিন্তা, ভিন্ন মত' (২০০৮) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যতীন্দ্রমোহন সারা জীবন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সুজিৎ চৌধুরী যে প্রসঙ্গগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা মূলত সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ, কৃষ্মকথা ও মঙ্গলকাব্য নিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাহিত্য-সমালোচক ও গবেষকগণ তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ বহুলাংশে অনালোচিত থেকে গেছে। প্রাবন্ধিক সেই অনালোকিত দিকটির প্রতি সকল গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। এই আলোচনায় তিনি যে বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন তার প্রতিপাদ্য ও সার্বিক সত্য উদ্‌ঘাটন হয়তো তিনি করেননি-অবশ্য সেই উদ্দেশ্যও তাঁর ছিল না। তিনি মূলত গবেষকদের চিন্তা ও চেতনায় এই বিষয়গুলি এনে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণাকে এগিয়ে নেওয়ার প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছেন। যে তিনটি বিষয় তাঁর আলোচনায় উঠে এসেছে সেগুলি হলো ঃ চর্যাপদ, কৃষ্ণকথা ও মঙ্গলকাব্য।

চর্যাপদ নিয়ে বহুমুখী গবেষণা হয়েছে। বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য- সমালোচক, পন্ডিত, গবেষকগণ তাতে অংশ নিয়েছেন। এই সব আলোচনার মাধ্যমে কতগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত পন্ডিত সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। প্রাবন্ধিক চর্যাপদের সামাজিক পটভূমি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলিকে আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেছেন। চর্যাপদ সম্পর্কে এই কথা মোটামুটি সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে চর্যাপদের বহিরঙ্গে বাংলার সমকালীন সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযাত্রা ও বস্তুগত অন্যান্য প্রভাবের ছাপ সুস্পষ্ট। চর্যার পদকর্তারাও যে নিজেরা নিম্নবর্গের মানুষ ছিলেন যে অনুমান করা হয়েছে। সুকুমার সেন বলেছেন ভোম্বীপাদ ও তন্ত্রীপাদ সম্ভবত জাতিবাচক অভিধা। অন্যদিকে নীহাররঞ্জন রায় শবরীপাদ সম্পর্কে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। সুকুমার সেন দেখিয়েছেন, চর্যাগীতিকারদের সকলের মতামত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেও সকল সময়ে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বহিরঙ্গের মিল থাকলেও তাঁরা সকলেই যে ধর্মসাধনার ব্যাপারে

সহমত পোষণ করতেন তা নয়।

প্রাবন্ধিকের মতে চর্যাপদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা ধারণাগুলি সহজে খন্ডনযোগ্য নয়। তাঁর মতে,

''তবে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকটিত তথ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই চর্যাপদ সম্পর্কিত সামাজিক বিশ্লেষণগুলি সারা হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়।''

টিপ্পনী

চর্যাপদের যে বিষয়গুলির প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেগুলি হলো ঃ

১। মুনিদত্ত তাঁর সংস্কৃত টীকা কাদের জন্য লিখেছেন? দেশজ ভাষায় লেখা গানগুলির সংস্কৃত ভাষ্য রচনার প্রয়োজন পড়ল কেন? কারা ছিলেন ওই টীকা তথা চর্যাপদের সমসাময়িক বোদ্ধা, অনুব্রজী তথা অনুসারী?

২। পন্ডিত সমাজ একমত যে চর্যাপদ রচনার কাল ও মুনিদত্তের টীকা রচনার কালের মধ্যে ব্যবধান ছিল দুই থেকে চার শতক।

৩। নীহাররঞ্জন রায়ের কথায় স্ববিরোধিতা। একজায়গায় তিনি বলছেন 'বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহাদের ধর্মের তত্ত্বকথা লোকায়ত ভাষায় জন সাধারণের চিত্তদুয়ারে পৌঁছাইয়া দেওয়া।' অন্য আরেক জায়গায় বলছেন, 'চর্যাপদের ভাষার নাম ছিল সন্ধাভাষা। কিন্তু যত মৌলিক সম্পূর্ণ এবং নিগূঢ় হোক না কেন সে ভাষা অদীক্ষিত জনের কাছে ছিল দুর্বোধ্য।'

প্রাবন্ধিক বলতে চেয়েছেন যে, সংস্কৃত ভাষা কোনো সময়েই সাধারণ মানুষের অধিগম্য ছিল না। সমাজের উচ্চকোটির মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই যে মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর তাই প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেছেন ঃ

''সকলেই জানেন যে মুনিদত্তের টীকাই চর্যাপদের প্রাথমিক তথ্যসূত্র, অথচ ওই টীকার সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য আদৌ বিবেচনা না করেই চর্যাপদ সংক্রান্ত প্রতিপাদ্য খাড়া করা হয়েছে। চর্যাপদ- গবেষণার ক্ষেত্রে এ একটা বড় রকমের অসম্পূর্ণতা আর ওই অসম্পূর্ণতার দিকে যোগ্য গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এই আলোচনার অবতারণা।''

প্রাবন্ধিক দ্বিতীয় যে বিষয়টির অবতারণা করেছেন তা হলো কৃষ্ণকথা। বৈষ্ণব সাহিত্যের তথা বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রাধা চরিত্র। অথচ এই রাধার উৎস নিয়ে যে প্রশ্ন দেখা দেয় তার যথাযথ জবাব পাওয়া যায় নি। বঙ্কিমচন্দ্র রাধার অনুসন্ধান করতে গিয়ে যা বলেছিলেন প্রাবন্ধিক শুরুতেই সেই মন্তব্যকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

''উপনিষদের এইরূপ গোপীর অর্থ আছে, কিন্তু রাসলীলার কোনো কথাই নাই, রাধার নামমাত্র নাই।.....সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশ বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই, অথচ কৃষ্ণ উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধা ভিন্ন

এখন কৃষ্ণনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের মন্দির নাই বা মূর্তি নাই। বৈষ্ণবদিগের অনের রচনায় কৃষ্ণের অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। যদি মহাভারতে হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে বা ভাগবতে রাধা নাই তবে এ রাধা আসিলেন কোথা হইতে?''

বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে দশম শতক বা তার কাছাকাছি সময়ে রচিত 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এ সর্বপ্রথম নায়িকা হিসাবে রাধার আর্বিভাব। দ্বাদশ শতকে জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে ব্যাপকভাবে উপস্থাপনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি- পুরুষ বা তন্ত্রের শিবশক্তির দ্বৈতবাদী তত্ত্বের বৈষ্ণবীয় বিকল্প হিসাবে রাধাতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ঃ দর্শনে ও সাহিত্যে' নামক গ্রন্থে তাকে পূর্ণাবয়ব তত্ত্ব হিসাবে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছেন।

টিপ্পনী

দর্শনের বাইরে রাধাতত্ত্বের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো এখনো অনালোকিত থেকে গেছে। প্রাবন্ধিক সেই অনালোকিত দিকটির প্রতি গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাধাতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশের যে তথ্য পাওয়া যায়, তার সবটাই বাংলা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের সঙ্গে জড়িত। তবে রাধার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আমাদের একটি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সামাজিক বিচারে রাধাকৃষ্ণের প্রেম শুধু পরকীয়া নয়, রাধা সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুলানী ও বয়োজ্যেষ্ঠা হওয়ায় জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধরনের প্রতিকূল উপাদান সত্ত্বেও রাধাকৃষ্ণের প্রণয় বাঙালি সমাজে সর্বাত্মকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। সামাজিক বিবর্তনের কোন পর্যায়ে বাংলায় রাধা কাহিনীর গ্রহণযোগ্যতা হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। সামাজিক পরিবেশ এধরনের কাহিনি গড়ে ওঠার অনুকূল ছিল। সেই কাহিনিই ধীরে ধীরে লোকায়ত জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে স্থান লাভ করে এবং তাতে কাহিনির পরবর্তী উত্তরণের পথ প্রশস্ত হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় বৈষ্ণবদের উপাস্য কৃষ্ণ এসেছিলেন বৃন্দাবন থেকে বাংলায়। অন্যদিকে রূপ-সনাতন রাধাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বাংলা থেকে বৃন্দাবনে। এই আদান-প্রদানের মধ্যপথেই সৃষ্টি হয়েছিল রাধাকৃষ্ণের যুগল সম্মিলনী। প্রাবন্ধিকের মতে ঃ

''এই প্রতিপাদ্য সম্পর্কে যদি যথাযথ অনুসন্ধান চালানো যায়। তবে হয়তো ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বাংলার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অবদানটিও আবিষ্কৃত হবে।''

তৃতীয় যে বিষয়টি প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন তা হলো মঙ্গলকাব্য। বিশেষ করে চন্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন লেখক। সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ মনসামঙ্গল ও চন্ডীমহগলের উৎস নিয়ে মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তবে আরো দুটি বিষয় আলোচনা সাপেক্ষ বলে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন। প্রথমত, চন্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল-দুটি কাব্যেই এই সত্য খুবই স্পষ্টভাবে প্রকটিত যে বণিক সমাজে গৃহীত না হলে চন্ডী বা মনসার পূজা সমাজে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হচ্ছে না। ধনপতি সওদাগর বা চাঁদ সওদাগর যে সুদূর অতীতের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করেছেন তা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বর্ণযুগের সঙ্গে এই দুটো কাহিনি সম্পৃক্ত। কিন্তু প্রাবন্ধিকের মতে সুনির্দিষ্টভাবে কাল-নিরূপণের কাজটা সম্পন্ন হয় নি। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রিস্টিয় অষ্টম শতক পর্যন্ত ছিল বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ। অন্যদিকে ব্রতীন্দ্রনাথের মতে প্রথম শতক পরবর্তী কয়েক শতক অথবা খ্রিস্টিয় প্রথম শতক বা তার আগে থেকে।

সমাজের নিয়ন্তা হিসাবে বণিক সমাজের অভ্যুত্থান কোন সময়ে হয়েছিল তা সুনির্দিষ্ট নয়।

অর্থাৎ রাজা, পুরোহিত বা স্মার্ত  ব্রাহ্মণরা নন, বণিকরা নির্ধারণ করেছেন কোন পূজা বৈধ, কোনটা অবৈধ। তাম্রলিপি, শিলালিপি অথবা অন্য সব লিখিত উপাদানের উপর নির্ভর করে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে কোথাও বণিক সমাজের সামাজিক নেতৃত্বের সমর্থনে কোনো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না। আর তাই প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেছেন ঃ

''তাহলে এমন অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত নয় যে আরও পূর্ববর্তী কোনও সময়ে বণিকরা সমাজ নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর চাইতে সুনির্দিষ্ট কোনও কাল কি নিরূপণ করা সম্ভব?''

টিপ্পনী

দ্বিতীয়ত, মঙ্গলকাব্যের কাহিনি অংশে এমন কৌতূহলপ্রদ উপাদান রয়েছে যার বহুমুখী তাৎপর্য গুরুত্ব নিয়ে আলোচিত হয় নি। ধনপতি সওদাগর খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা করতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে পূজার আয়োজন পদাঘাতে বিনষ্ট করেছিলেন, অন্যদিকে চাঁদ সওদাগরও সনকার মনসা পূজার আয়োজন একইভাবে পন্ড করেছিলেন। এখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো-অন্তঃপুরচারিণী নারী ধর্মাচারের ব্যাপারে স্বতন্ত্র একটি ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতেন, নারী দেবী ছিলেন তাঁদের আরাধ্য। গৃহকর্তা পুরুষ অভিভাবকের পুরুষ দেবতার পূজোর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ততটা ঘনিষ্ঠ ছিল না। আর নারীদেবীর প্রতি পুরুষ কর্তাদের মনোবাব ছিল শত্রুতামূলক। এছাড়া প্রাগর্যে বাংলার আদি কৌমগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল আদিম কৃষি পদ্ধতির অনুসারী। আর সেই সূত্রে দেবীপূজক- একথা ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেছেন। অন্যদিকে মহামতি অশোক ধর্মীয় ব্যাপারে উদার ছিলেন। কিন্তু শিলালিপি থেকে জানা যায় তিনি এক ধরনের ধর্মাচার সম্পর্কে তীব্র বীতরাগ প্রদর্শন করেছেন- তা হলো 'মঙ্গল'। প্রাবন্ধিক তাই মন্তব্য করেছেন ঃ

''মঙ্গল কাব্যের ধর্মীয় উৎস নিরূপণ অশোকের এই নিষেধাজ্ঞার কথা কেউ উল্লেখ করেছেন বলে দেখিনি। আমার ধারণা লোকায়ত সমাজের কামনাবাসনাসঞ্জাতব্রতানুষ্ঠানজাতীয় ধর্মাচারের সাধারণ অভিধা ছিল 'মঙ্গল' আর বৌদ্ধ চিন্তায় এগুলো ছিল নিন্দিত।''

এই সমস্ত তথ্যগুলির মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের পরবর্তী সলয়ে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নতুন- পুরাতনের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এক বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছিল। সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্কের বিবর্তনের পর্যায়গুলি নিরূপণের জন্য এ ধরনের অনুসন্ধান জরুরী। আর তাই প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেছেন ঃ

''দেশের রাজনৈতিক ও আর্থ- সামাজিক বিবর্তন প্রবাহের সঙ্গে সাহিত্য-সৃষ্টির যে অন্তঃশীল সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয়টি আরও গভীরভাবে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ না করলে চলবে কী করে?''

## পুরাণের পুনর্জন্ম ও রবীন্দ্রনাথ

### নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৯০২-১৯৬৫) নিষ্ঠাবান শিক্ষাব্রতী হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আমাদের আলোচ্য 'পুরাণের পুনর্জন্ম ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি তাঁর 'পুরাণের পুনর্জন্ম ও অন্যান্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বইটির ভূমিকা লিখেছেন জগদীশ ভট্টাচার্য। আমাদের আলোচ্য

প্রবন্ধটি সম্পর্কে জগদীশ ভুমিকাতে বলেছেন, ''' পুরাণের পুনর্জন্ম ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধেই আলোচ্য গ্রন্থের মূলসুর ধরা পড়েছে। প্রবন্ধকার বলেছেন, য়ুরোপীয় রেনেসাঁস যেমন গ্রীক চিন্তাজগৎকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিল এবং ব্যক্তিমুক্তি ও মানবতাবোধের উদ্বোধন করে সমগ্র য়ুরোপের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুলেছিল, তেমনি আমাদের দেশেও উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী রেনেসাঁসের আলোকে প্রাচীন জ্ঞান ও বিদ্যার পুনর্জন্ম হল এবং নবমানবতার দৃষ্টিতে বৈদিক বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগের সাহিত্য-সংস্কৃতি নতুন প্রাণশক্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো।''

টিপ্পনী

পুরাণের পুনর্জন্ম বা পুনর্নির্মাণ রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবির প্রতিভাবলেই সম্ভব হয়েছে। প্রাবন্ধিক ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষা করে বলেছেন, মধুসূদন ও বঙ্কিম এই নতুন যুগের অগ্রগূত। তাঁরা বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকতায় দীক্ষিত করেছেন। সাহিত্যে এই আদুনিকতা নতুন ধ্যান-ধারণায় নতুন ভাষায় মানবমনের সূক্ষাতিসূক্ষ জটিল গ্রন্থির বিমোচন ও বিশ্লেষণে।

এই প্রবন্ধে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ-পুরাণ ও জাতক এবং কালিদাসের কাব্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ যে সব কাব্য নাটকাদি রচনা করেছেন তার বিচারবিশ্লেষণ করা হয়েছে। রামায়ণ থেকে আছে 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'ভাষা ও ছন্দ', 'পতিতা'; মহাভারত থেকে 'কচ ও দেবযানী', 'চিত্রাঙ্গদা', 'গান্ধারীর আবেদন', 'নরকবাস', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'; ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকাম, জাবালের উপাখ্যান থেকে 'ব্রাহ্মণ'; বৌদ্ধ মহাবস্ত্ববদান অবসম্বনে 'মালিনী ' ও 'পরিশোধ', কুশ জাতক থেকে 'রাজা' আর 'শাপমোচন', শার্দুল কর্ণাবদান থেকে 'চন্ডালিকা' এবং অবদানশতক থেকে 'পূজারিণী' এবং তার নাট্যরূপ 'নটীর পূজা' আলোচিত হয়েছে।

প্রাবন্ধিক মূল কাহিনির বিবরণ দিয়ে কীভাবে সেগুলি আধুনিক মানবতাবাদের আলোক শিল্পরূপ- এর মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ করে তার অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য ভাবধারা এবং আধুনিকতা প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনের নেপথ্যে এর প্রভাব ক্রিয়াশীল। প্রাবন্ধিকের মতে,

''উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধপুরাণ ও জাতক এবং কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। মৌলিক উপাদানগুলো এমনভাবে আত্মসাৎকৃত হয়েছে যে তাদের পার্থক্য অনুভূতিগম্য হয় না; মনে হয় এগুলো রবীন্দ্রনাথের, অন্যের নয়।''

## 'রবি পত্রিকা ঃ ভাবের ঝুলি ঃ রবীন্দ্র রচনা ও পাঠান্তর

### রমাপ্রসাদ দত্ত

রমাপ্রসাদ দত্তের এই প্রবন্ধটি 'শতাব্দীর ত্রিপুরা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য-পত্রিকার ইতিহাসে 'রবি' পত্রিকার গুরত্বি অপরিসীম। 'রবি' পত্রিকার হাত ধরেই ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যচর্চা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গেছে। প্রাবন্ধিকের মূল লক্ষ্য 'রবি' পত্রিকার 'বাবের ঝুলি' অংশ। এই 'ভাবের ঝুলি' যাঁর সাহিত্য ও সৃষ্টিকর্মকে স্থান দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ভাবের ঝুলি'তে রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত রচনা স্থান পেয়েছে সেগুলি আগে বা পরে 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'ভারতবর্ষ', 'শান্তিনিকতন' প্রভৃতি পত্রিকাতেও

অনেকগুলো স্থান করে নিয়েছে। এই রচনাগুলি পরে আবার 'রবীন্দ্ররচনাবলী' ও 'গীতবিতান' প্রভৃতি গ্রন্থে সংযুক্ত হয়েছে। 'রবি' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত রচনা অন্য জায়গায় প্রকাশ হয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যে অল্পবিস্তর পাঠান্তর রয়েছে তার আলোচনাই প্রাবন্ধিকের মূল লক্ষ্য।

টিপ্পনী

ত্রিপুরা থেকে 'রবি' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় আষাঢ়, ১৩৩১ বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত ছিলেন। 'রবি'র মোট ছয় বছরে চব্বিশটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাটিতে রবীন্দ্রনাথের জন্য 'ভাবের ঝুলি' সুনির্দিষ্ট রাখা ছিল। যদিও 'রবি' র দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় 'ভাবের ঝুলি'তে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি গান স্থান পেয়েছে।

'রবি' পত্রিকায় প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা প্রকাশিত হয়নি। 'রবি'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ) 'ঐ মরণের সাগর পারে' গানটি প্রকাশিত হয়। এই গানটি পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর জন্মশতবার্ষিকি সংস্করণের চতুর্থ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। 'স্বরবিতান'-এর দ্বিতীয় খন্ডে গানটির স্বরলিপি আছে। এই গানটি রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫) গ্রন্থেও রয়েছে। এই সংখ্যারই 'ভাবের ঝুলি'তে রবীন্দ্রনাথের 'বেঠিক পথের পথিক' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। পরে এই কবিতাটি 'পূরবী' কাব্যে যুক্ত হয়েছিল।

'রবি'-র প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দ) 'ভাবের ঝুলি'তে 'রক্তকরবী'র সাতটি গান প্রকাশিত হয়েছিল। ওই বছরের 'প্রবাসীর' আশ্বিন সংখ্যায় ও এই সাতটি গান প্রকাশিত হয়েছিল। এই গানগুলির নানা পাঠান্তর লক্ষ করা যায়।

'রবি' পত্রিকার প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা (চৈত্র ১৩৩১ বঙ্গাব্দ) 'ভাবের ঝুলি'তে রবীন্দ্রনাথের 'সাধন কিসের আসন নেবে' গানটির প্রকাশ হয়েছিল। রবীন্দ্র রচনাবলীতে এই গানটি যুক্ত হয়েছিল। এছাড়া 'আনমনা গো আনমনা' গানটিও এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় যা ১৩৩১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'বিচিত্রা'-তেও প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্র রচনাবলীতেও পরে সংকলিত হয়। তাছাড়া এই গানটি 'শাপমোচন' (১৯৩১) নৃত্যনাট্যেও অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই গানদুটির কোনো পাঠান্তর নেই।

'রবি'-র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা বের হয় আষাঢ় ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দে। এই সংখ্যার 'ভাবের ঝুলি'তে রবীন্দ্রনাথের 'আকন্দ' ও 'তৃতীয়া' কবিতা দুটি প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী' পত্রিকাতেও এই কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। 'পুরবী' কাব্যেও কবিতা দুটি স্থান পেয়েছে। 'আকন্দ' কবিতাটির পাঠান্তর পাওয়া যায়।

'রবি'-র দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) 'ভাবের ঝুলি' তে রবীন্দ্রনাথের দুটি গান ও 'তারা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। গান দুটি প্রথমে 'শান্তিনিকেতনে'র ভাদ্র সংখ্যা ও 'তারা' কবিতাটি 'ভারতবর্ষে'র আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম গানটি ও কবিতাটির পাঠান্তর রয়েছে।

'রবি' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (আষাড় ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ)'ভাবের ঝুলি'তে রবীন্দ্রনাথের গান 'মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা' মুদ্রিত হয়েছে। এই গানের কোনো পাঠান্তর নেই। এই বর্ষেরই দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ) 'ভাবের ঝুলি'তে

রবীন্দ্রনাথের মোট নয়টি গান আছে। এই গানগুলি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'রবীন্দ্র রচনাবলী'তেও স্থান পায়। গানগুলির পাঠান্তর রয়েছে।

'রবি'-র তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) 'ভাবের ঝুলি'তে 'গীতপঞ্চক' নামে রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি গান প্রকাশিত হয়। এই গানগুলি আগে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'সবুজপত্রে'র কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'রবীন্দ্র রচনাবলী'-তেও এগুলি সংকলিত হয়েছে। গানগুলির পাঠান্তর লক্ষ করা যায়।

তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত 'ভাবের ঝুলি' তে রবীন্দ্রনাথের লেখা পাওয়া গেলেও চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরের কোনো সংখ্যাতেই 'ভাবের ঝুলি' শীর্ষক রচনা নেই। 'ভাবের ঝুলি' ছাড়াও দুএকটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা ও রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত বিষয় স্থান পেয়েছে। 'ভাবের ঝুলি'র অধিকাংশ লেখাই 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার কারণ বিসেবে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন, 'ভাবের ঝুলি' র মূল্য বহির্ত্রিপুরার লেখকদের কাছে হয়ত ততটা প্রকাশমান ছিল না।''

টিপ্পনী

## ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাসে কিছু দৃষ্টিপাত

### অপরাজিতা রায়

রাজন্য আমল থেকে বাংলা ভাষা ত্রিপুরায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, চৈতন্য জীবনী, পদাবলী প্রভৃতি বাংলায় অনুবাদ হয়েছে রাজার আদেশে। আবার রাজ-রাজরার ইতিহাস সংকলিত হয়েছে বাংলা 'রাজাবলী'তে। পরবর্তী সময়ে 'রবি' ও অন্যান্য সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমে ত্রিপুরায় সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি প্রভৃতির চর্চা হয়েছে। প্রথম থেকেই এই পত্রিকাগুলিতে কবিতা, গল্প, গান প্রভৃতির চর্চা লক্ষ করা যায়। প্রাবন্ধিক অনুমান করেছেন উপন্যাসই ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। যদিও 'রবি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই পরিমলকুমার ঘোষের 'খাচার পাখী' উপন্যাসটি পাওয়া যায়। উপন্যাসটি অবশ্য সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ হয় নি।

প্রাবন্ধিক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ত্রিপুরার রাজন্য ইতিহাস নিয়েই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'রাজর্ষি' উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসাবে পরিচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' যা ইতিহাস নিয়ে রচিত। 'কপালকুন্ডলা' ও 'মৃণালিনী' উপন্যাস দুটি ও ইতিহাসের পটভূমিতে লেখা।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ত্রিপুরার গল্প-সাহিত্যের শুরু বলে প্রাবন্ধিক দাবি করছেন। যদিও এর আগেও গল্পের চর্চা অল্পবিস্তর হয়েছে। জীবনের উত্থান-পতন, জটিল ঘটনাবর্ত এবং বিস্তৃতি উপন্যাসের জন্য দরকার। ত্রিপুরার ভারতভুক্তি, সামন্ততন্ত্রের অবসান, উদ্বাস্তু সমস্যা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৮০ সালের ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ ত্রিপুরায় সংঘটিত হলেও- উপন্যাসে তার প্রতিফলন সেভাবে ঘটেনি। এর মধ্যেও যাঁরা উপন্যাস রচনার প্রয়াস করেছেন তাঁরা হলেন অনুপ ভট্টাচার্য, দীপক দেব, দুলাল ঘোষ, বিমল সিংহ, সমরজিৎ সিংহ প্রমুখ। ত্রিপুরার পাহাড়ের কোল থেকে তুলে আনা জীবনের প্রতিচ্ছবি পাচ্ছি ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত বিমল সিংহের 'লংতরাই' উপন্যাসে। ত্রিপুরার মাটির গন্ধ পাওয়া যায় বিমল সিংহের

ছোটোগল্পগুলিতেও। তাঁর ১৯৮৭ সালে লিখিত উপন্যাস 'তিতাস থেকে ত্রিপুরা'-র পটভূমিও ত্রিপুরা ও তার সীমা সংলগ্ন ভূমিখন্ড।

ত্রিপুরার বিশিষ্ট গল্পকার দীপক দেব-এর 'রক্ত মাংসের শরীর' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। তাঁর 'ধূসর পান্ডুলিপি', 'গোলাপ কেন কালো' প্রভৃতিতেও উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ গুরুত্ব পেয়েছে অনুপ ভট্টাচার্যের উপন্যাসে। গল্পকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা আগেই পেয়েছেন, ২০০১ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর উপন্যাস 'প্রিয়ভূমি'।

টিপ্পনী

জয়া গোয়ালা গল্পকার হিসেবে নতুন দিক নির্দেশ করেছেন। নিজে উঠে এসেছেন চা বাগানের শ্রমিক পরিবার থেকে। তাঁর মাতৃভাষাও বাংলা নয়, পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন সাঁওতাল ভূমি থেকে। উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর চা বাগানে তাঁরা আবাস গড়ে তোলেন। তাঁদের ভাষা হয়ে ওঠে সাঁওতাল, হিন্দি, বাংলা মিশ্রিত এক আত্মপ্রকাশের ভাষা। আর এই ভাষাকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'ছিলোমিলো' ভাষা। বাংলা ছোটোগল্প লিখেই তাঁর মাত্রা শুরু। ত্রিপুরার চা বাগানের উপেক্ষিত শ্রমিক জীবন নিয়ে তিনি প্রথম উপন্যাস লিখলেন। তাঁর দুটি উপন্যাস 'দেয়াল' ও 'তবুও মাদল বাজে' একসঙ্গে গ্রন্থবদ্ধ হয় 'অন্য মানুষ ভিন্ন রঙ' নামে, ২০০৩ সালে। টগর ভট্টাচার্যের 'খোলা জানালায়' প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। বাস্তব জীবন নির্ভর এই উপন্যাসটিও ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাসের ধারায় বিশিষ্টতার দাবি রাখে।

প্রখ্যাত গল্পকার দুলাল ঘোষের 'অগ্নিসূত্র' উপন্যাসটি এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। 'একুশ শতক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় এটির নাম ছিল 'রাহু'। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন সমরজিৎ সিংহ। তাঁর উপন্যাস 'অন্য জীবন' স্যন্দন পত্রিকার ১৩৯৫ শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। হরিভূষণ পালের 'যোগপর্ব' উপন্যাসটি দৈনিক সংবাদের ১৪১৩ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিক দাবি করেছেন, উপন্যাস 'অনেক সময়ই ইতিহাসের এক বিশিষ্ট উপাদান হয়ে ওঠে।' কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, উপন্যাস এক ভিন্ন শিল্পকর্ম। সেখানে ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদের সঠিক তথ্যের প্রাপ্তি সম্ভব নয়। কারণ যদি 'উপন্যাস' হয়, তবে তা কখনো ইতিহাস হতে পারে না। ঐতিহাসিক উপাদান ও প্রেক্ষাপট উপন্যাস রচনায় সহায়তা করতে পারে। কিন্তু উপন্যাস 'ইতিহাসের বিশিষ্ট উপাদান হয়ে ওঠে' প্রাবন্ধিকের এই দাবি সমর্থন করা যায় না। তাছাড়া প্রবন্ধটির আলোচনা অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ। যে দু- চারজন ঔপন্যাসিকের কথা বলেছেন তাদের উপন্যাসগুলি আলোচনার পাশাপাশি ত্রিপুরায় বাংলা উপন্যাস চর্চার একটি রূপরেখা তুলে ধরলে আলোচনা আরো ঋদ্ধ হতে পারতো।

# তৃতীয় একক

## নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্তের 'জীবনের মানে'

### নাট্যকার পরিচিতি ঃ

নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্তের জন্ম ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬। ত্রিপুরায় বাংলা নাট্য আন্দোলনের প্রসারে চন্দন সেনগুপ্তের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রত্যক্ষ প্রেরণায় 'নাট্যভূমি'-র জন্ম। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৯ এই সাত বছরে 'নাট্যভূমি'-র অবদান কৃতিত্বের দাবি রাখে। নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক চিন্তার জগতে প্রগতিশীল ধারারও তিনি পথিক ছিলেন। এছাড়া, যে কোনো শিল্পের ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ একান্ত জরুরী- যা তাঁর ছিল। সমস্ত রকম বন্ধন ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন। ব্যক্তিজীবনে আত্মবিশ্বাসী ও আশাবাদী মন ছিল বলেই তাঁর প্রতিটি রচনাই ইতিবাচক।

নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি নতুনত্ব নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। বাস্তবধর্মী মঞ্চ ও উপকরণ ব্যবহারে তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর প্রতিটি নাটকেই ফুটে উঠেছে যুগযন্ত্রণার ছবি। মানুষের জীবনে নানা প্রতিকূলতা রয়েছে, নানা নেতিবাচক দিক রয়েছে। তা সত্ত্বেও মানুষ শেষপর্যন্ত সমাজবদ্ধ হয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়াবে-এই প্রত্যাশা তিনি রেখেছেন। তাঁর নাটকের বিষয় মূলত মানুষ; মানুষের জীবন, জীবন সংগ্রাম, সুখ-দুঃখ- ভালোবাসা, স্বপ্ন- প্রেম- আশা। তাঁর নাটকগুলিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, পূর্ণাঙ্গ নাটক ও একাঙ্ক নাটক।

পূর্ণাঙ্গ নাটক ঃ 'জীবনের মানে', 'সাদা পায়রার জন্যে', 'অন্য পৃথিবী', 'আরোহন', 'প্রসঙ্গ ঃ হরধনু', 'সব্যসাচী', 'সোনার হরিণ', 'তাম্রপত্র', 'ভূমিজ', 'ডেড লেটার', 'চাওয়া'।

একাঙ্ক নাটক ঃ 'ইসকাবনের বিবি', 'সূর্য উঠবে বলে', 'ভোট', 'কর্তার ভূত', 'জন্মদিন', 'একটি দিন একটি স্বপ্ন', 'এখনো মানুষ', 'রং চোর', 'অমৃত', 'আজকের নীলাম', 'জলছবি (একক সংলাপ)'।

১৪ মার্চ, ১৯১৬ সালে নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্তের প্রয়াণ ঘটে।

### নাটক সম্পর্কিত কিছু তথ্য ঃ ত্রুটি ও সংশোধন

আমাদের আলোচ্য চন্দন সেনগুপ্তের 'জীবনের মানে' নাটকটি ত্রিপুরা দর্পণ থেকে প্রকাশিত 'চন্দন সেনগুপ্তের নাট্য সমগ্র' গ্রন্থে সংকলিত প্রথম নাটক। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন কমল রায় চৌধুরী। সম্ভবত এই সংকলনের পুরোভাগে প্রকাশকই রয়েছেন। কারণ এই সংকলন গ্রন্থে কোনো সম্পাদকের নাম পাওয়া যাচ্ছে না। একজন নাট্যকারের সারা জীবনের রচনাসম্ভারকে প্রকাশ করা নিশ্চয়ই কৃতিত্বের। কিন্তু কৃতিত্বের দাবিদার হলে, যা কিছু ত্রুটি থাকবে তারও দায়ভার সেই কৃতিত্ব-প্রাপকেরই। নাটকগুলি সংকলনের সময় কিছুটা সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। কারণ এমন কিছু ত্রুটি রয়েছে যা নাট্যকারের হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। সংকলকের অসাবধানতার জন্যও সেই ত্রুটি ঘটতে পারে। যাইহোক, সেই ত্রুটিগুলি সংশোধন

টিপ্পনী

করে সংকলিত হলে পাঠকদের সুবিধে হতো। ত্রুটগুলি বিষয়কেন্দ্রিক মোটেই নয়- কাঠামো অর্থাৎ পর্ব ও দৃশ্য বিভাজনের ত্রুটি।

নাটক শুরু হওয়ার আগে দৃশ্যবিভাজন অনুসারে চরিত্রদের নামোল্লেখ করতে গিয়ে চারটি দৃশ্য, একটি অন্তদৃশ্য ও দুটি গর্ভদৃশ্যের উল্লেখ রয়েছে। অথচ, নাটকে দৃশ্য, অন্তদৃশ্য ও গর্ভদৃশ্যের সংখ্যা চার, এক ও দুইয়ের বেশি।

টিপ্পনী

নাটকের শুরুতে প্রথম পর্ব / প্রথম দৃশ্যের উল্লেখ রয়েছে। এরপর প্রথম দৃশ্যের অন্তর্গত প্রথম অন্তদৃশ্য। তারপর শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় দৃশ্য। দ্বিতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত গর্ভদৃশ্য- ১ দিয়ে এই দৃশ্যের সমাপ্তি। এরপর তৃতীয় দৃশ্য এবং পরে এই দৃশ্যেরই অন্তর্গত গর্ভদৃশ্য- ২। তারপর থাকছে চতুর্থ দৃশ্য এবং পরে দ্বিতীয় অন্তদৃশ্য। এখানেই প্রথম পর্ব শেষ। এরপর দ্বিতীয় পর্ব এবং পরে থাকছে তৃতীয় অন্তদৃশ্য। ক্রম অনুসারে এরপর পঞ্চম দৃশ্য হওয়ার কথা। কিন্তু নাটকে পঞ্চম দৃশ্য নেই। আমরা পাচ্ছি যথাক্রমে ষষ্ঠ দৃশ্য, গর্ভদৃশ্য- ৩, সপ্তম দৃশ্য। এরপর পুনরায় দ্বিতীয় পর্ব-এর উল্লেখ এবং এরই সঙ্গে চতুর্থ অন্তর্দৃশ্য। সব শেষে অষ্টম দৃশ্য দিয়ে নাটক সমাপ্ত হয়েছে।

আমরা নাটকটি পাঠ করার সময় দ্বিতীয় পর্বের সাথে পঞ্চম দৃশ্য ধরে নিয়ে অগ্রসর হব। কারণ যখনই লেখক, সোমার কথাবার্তা হয়েছে তা একটি দৃশ্যের অন্তর্গত দেখানো হয়েছে। 'দ্বিতীয় পর্ব' অংশেও লেখক ও সোমার কথা রয়েছে।

## কাহিনী বিন্যাস ঃ

নাটকের প্রথম দৃশ্যে আমরা সোমা, লেখক ও অদ্রীশকে পাচ্ছি। সোমা লেখকের স্ত্রী এবং অদ্রীশ তাঁর বন্ধু। সোমা ও লেখকের কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছে লেখক ওরফে শঙ্কর একটি নাটকের প্লট নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। আর এই প্লটের চিন্তাসূত্র হচ্ছে এক বিয়েবাড়িতে সুবিনয়বাবু নামমাত্র পরিচিত আর্থিক সঙ্গতিহীন ৩৫ বছরের এক অবিবাহিতা মেয়ের চাকরি প্রার্থনা। মেয়েটি তার দীর্ঘ দুই হাত বাড়িয়ে বলছে ঃ

''সুবিনয়দা, এই আমার স্বাস্থ্য, আমার বয়স ৩৫, আপনি বলুন একটি মেয়ের জীবনের ৩৫ বৎসর পেরিয়ে গেলে আর কি বাকী থাকে?''

লেখক সেই অদ্ভুত পরিবেশকে, পরিবেশের বৈপরীত্যকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। একদিকে বিয়ে বাড়ির আনন্দ, অন্যদিকে একটি দুঃস্থ মেয়ের চাকরির জন্য কাতর প্রার্থণা। এক মধ্যে লেখক নাটকীয় উপাদান খুঁজে পেয়েছেন, যা দিয়ে তিনি নাটকের কাহিনী নির্মাণ করতে চান। লেখক তাঁর বন্ধু অদ্রীশ ও স্ত্রী সোমাকে নাটকের আইডিয়া শোনাতে চান। নাটকের শুরু হবে এক অসহায় অবলম্বনহীন মেয়ের মরার প্রস্তুতি দিয়ে আর শেষ হবে ওর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। একটি রাতের দৃশ্যেই নাটকের শুরু ও শেষ।

এরপর প্রথম অন্তদৃশ্যে লেখকের নাটকের আইডিয়ার উপস্থাপনা। সহায়-সম্বলহীন মেয়েটির নাম রেবা। রেবা ও তার বাবার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এই দৃশ্যের সমাপ্তি। অমাবস্যায় কালীপূজার রাত। মেয়েটির বিয়ে হবে। তারই প্রস্তুতি চলছে তার। কিন্তু তার কথা থেকেই

জানা যায়, এই বিয়েতে সানাই বাজবে না। চুপিচুপি বিয়ে হবে, কেউ জানবে না। কিন্তু এরপরই এক ভয়ানক কথা শোনা যায় রেবার মুখে,'চুপিচুপি আমি মরে যাব।' মৃত্যুর মূল কারণ জানা না গেলেও, একটা আভাস পাওয়া যায় তার কথায়, ''আঃ (পেটে হাত দিয়ে) সোনা আমার, একটু শান্ত হয়ে থাক, কোন ভয় নেই। আজ যে তোর মা মুক্তি পাবে।'' কুমারীর গর্ভে সন্তান-সামাজিকভাবে এক প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেয় তাকে। আর পাশাপাশি পাঠকেরও কৌতুহল বেড়ে যায়। তার মনেও প্রশ্ন দেখা দেয় কেন?

পাশের ঘর থেকে বাবা কাশতে কাশতে উঠে আসেন। কালীপূজার প্রসাদ এনেছে কিনা মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন? রেবা বাবার সঙ্গে খুব একটা স্বাভাবিক ব্যবহার করে না। বাবাও মেয়েকে 'ডাইনী' বলেন, মরতে বলেন। মাতৃহীনা রেবা প্রত্যুত্তরে বলে, ''তুমি এখান থেকে প্রার্থণা করো বাবা। যেন মরণ আমার খুব তাড়াতাড়ি হয়।'' এখানেই প্রথম অন্তদৃশ্যের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় দৃশ্যে পুনরায় অদ্রীশ, শঙ্কর ও সোমা। অদ্রীশের কাছে লেখকের ভাবনাটা বেশ নাটকীয় লাগলেও সোমা রেবার ওই অবস্থা ও মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাওয়াকে সমর্থন করতে পারছে না। লেখকের পিড়াপিড়িতে কাজ থাকা সত্ত্বেও বাকি অংশ শুনতে রাজি হয় সোমা। লেখকের কাছে সে জানতে চায় রেবা কেন মরে যেতে চাইবে? রেবার বাড়ির পরিবেশ কী? সন্তু কে? জবাবে সেখক বলেন, কাজের জন্য সন্তু তার প্রভু অবিনাশ রায়ের কাছে গেছে। সে ও তার বন্ধুরা মিলে যে সব কাজ করে সেই কাজই সন্তুর আইডেনটিটি। সন্তুর জন্য তার বন্ধু অপেক্ষা করছে।

এরপর গর্ভদৃশ্য- ১। সন্তুর দুই বন্ধুর কথাবার্তা চলছে। প্রথম বন্ধুর নাম শান্তনু ও দ্বিতীয় বন্ধু বিনয়। তাদের গুরু সন্তু ও অবিনাশ রায়ের বাড়ি গেছে। সন্তুর বোন রেবা আজকাল অবিনাশ রায়ের বাড়ি যাতায়াত করে। এই বিষয়টি তারা সন্তুকে জানাতে চায়। সন্তু ফিরে এসে খবর দেয় অবিনাশবাবুর কথামত কালীপূজার রাতেই একটা বাজার পুড়িয়ে দিতে হবে। অবিনাশবাবুর হয়ে এই ধরনের কাজ তারা আগেও করেছে। টাকা চাইতে গেলে পুরনো কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় অবিনাশ। শান্তনু ও বিনয় রেবার অবিনাশবাবুর বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারটা সন্তুকে জানালে সে রেগে যায়। পরিকল্পনামতো তারা বাজারে আগুন লাগানোর জন্য বেড়িয়ে যায়।

তারপর তৃতীয় দৃশ্যের শুরু। লেখক ও সোমার মধ্যে কথা চলছে। অবিনাশ রায় সম্পর্কে বিশেষ পরিচয় এখনো না পাওয়ায় সোমা লেখকের কাছে জানতে চায় 'অবিনাশ রায় কে? লেখকের কথা থেকে জানা যায়, অবিনাশ চোরা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত; গুন্ডা পোষে, প্রশাসনের লোক তার কথায় ওঠে- বসে, প্রচুর ক্ষমতাবান। রেবার সঙ্গে অবিনাশের সম্পর্ক জিজ্ঞেস করলে লেখক সোমাকে জানায়, 'রেবা ওর পোষা মুরগী ছিল।'

এরপর গর্ভদৃশ্য- ২। বেশ কয়েকদিন ধরে চারটি ভাগে অবিনাশ ও রেবার কথাবার্তা শোনানো হয়। সোমাকে অবিনাশ চাকরির আশ্বাস দিয়ে পরের দিন সন্ধ্যায় আসতে বলে। পরের দিন সে রেবাকে একটা বিশেষ জায়গায় যাওয়ার কথা বলে। এবং পরের দিন বিকেল পাঁচটায় আসতে বলে। কিন্তু এরপরও অবিনাশ রেবার জন্য কিছু করতে পারে না। রেবা কাঁদতে থাকলে যে জানায়, ''চাকরি তোমায় দিতে পারিনি-অন্য কিছুতো দিতে পারি, ভালোবাসা- আমি তোমাকে ভালোবাসি রেবা, আমার সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসি।'' এরপরের ভাগেই অবিনাশের

টিপ্পনী

স্বরূপ বোঝা যায়। ভালোবাসলেও রেবাকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ হিসাবে সে বয়সের ফারাকের কথা বলে এবং রেবার অনের পুরুষ বন্ধুর প্রসঙ্গ তুলে ধরে।

তারপর চতুর্থ দৃশ্য। এখানে জীবন সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সোমা প্রশ্ন তোলে। জীবনের মূল্যহীনতাকে বড়ো করে না দেখিয়ে গঠনমূলক চিন্তা করার পরামর্শ দেয়। লেখক জানান তিনি জীবনের নিয়ন্ত্রক নন। কেন ওরা মরে যেতে চায়, ওদের জীবন কেন ছন্নছাড়া তা তিনি শুধু অনুভব করতে পারেন।

টিপ্পনী

এরপর দ্বিতীয় অন্তদৃশ্যের অবতারণা। রেবা দরজা খুলে দিলে সন্তু প্রবেশ করে। বাবা ও রেবাকে সে সাবধান করে দেয়, কেউ এলে তারা যেন তার বাড়ি থেকে বাইরে বেরোবার খবর না দেয়। একটু আগে সন্তু ও তার বন্ধুরা মিলে অবিনাশ রায়ের নির্দেশে বাজারে আগুন লাগিয়ে এসেছে। বাবা ও রেবা সন্তুর কুকীর্তির প্রতিবাদ করলে সন্তু রেগে যায়। যে রেবাকে অবিনাশ রায়ের বাড়ি যাওয়ার মতলব সম্পর্কে প্রশ্ন করে। এরপর তাদের কথাবার্তা ঝগড়ার পর্যায়ে পৌঁছায়। শেষপর্যন্ত সন্তু রেবাকে মরে যেতে বলে। বাবাও তার প্রতিবাদ করে বলেন, 'তোর মুখ দেখাও পাপ- তুই মর।' এর মধ্যে সন্তুর বন্ধুরা প্রবেশ করে। ওরা জানায় অবিনাশ রায় পালিয়েছে। তাদের কাজের টাকা আদায় হয়নি। সন্তুও পালানোর প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বন্ধুর পরামর্শে মত পরিবর্তন করে। শেষে তারা 'দুপাত্তি' খেলতে বসে যায়।

তারপর নাটকের দ্বিতীয় পর্ব। নাটকের দৃশ্যক্রম বজায় রাখতে একে পঞ্চম দৃশ্য ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই পর্বে ও দৃশ্যে নাটকের কাহিনী নতুন দিকে মোড় নিয়েছে। সোমা লেখতের মেয়েদের নিয়ে রোমান্টিক বিলাসিতাকে নিষ্ঠুরতা বলেছে। লেখকের নাটক-পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সোমা। রেবাকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি সোমা। রেবা যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সেই অবস্থায় মৃত্যুই কি অনিবার্য? এই অবস্থায় একটি মেয়েকি শুধু মৃত্যুর কথাই ভাববে? তাকে বাঁচানোও যেতে পারে। লেখকের কথামতো নাটকের পরবর্তী কাহিনী অগ্রসর হবে সোমার ভাবনা অনুসারে।

এরপর তৃতীয় অন্তদৃশ্য। রেবা প্রাণপণভাবে বাঁচতে চাইছে। কিন্তু এতো অপমান নিয়ে বাঁচা সম্ভব নয় বলে সে বলছে, 'আমি মরবো মরবো কিন্তু....কিন্তু..... ।' পাশের ঘর থেকে বাবা চলে আসেন। প্রথম পর্বে বাবা ও রেবার মধ্যে যে উত্তেজক কথাবার্তা হয়েছে এই পর্বে তা নেই। এই পর্বে দুজনের কথাবার্তার নিবিড় বন্ধন প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মায়ের কথা এসেছে। আত্মহনন নিয়েও তাদের কথা হয়েছে। রেবার প্রশ্নের উত্তরে বাবা জানিয়েছে কাপুরুষেরাই আত্মহত্যা করে। মায়ের প্রসঙ্গ এলে বাবা জানান ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে তাদের অনেক স্বপ্ন ছিল। দেশকে স্বাধীন করা নিয়ে তাদের স্বপ্ন ছিল। শেষপর্যন্ত দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সারা বাংলায় একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরী হয়েছে। তারপর অনেক কষ্টে তারা ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু তাদের গোত্র নির্ধারিত হয়ে গেছে 'উদ্বাস্তু'। মায়ের মনেও তাদের নিয়ে স্বপ্ন ছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষয় চলছিল। শেষপর্যন্ত মায়ের মৃত্যু হলো। বাবার ইচ্ছানুসারে রেবা গান গায়। বন্ধুসহ সন্তু দরজায় ধাক্কা দেয়।

ষষ্ঠ দৃশ্য। সোমা আর লেখকের কথাবার্তা চলছে। লেখক সোমার ভাবনায় অভিভূত। সোমার মতে মেয়েরা মূল্যবোধ হারাতে চায় না। লেখক সন্তু সম্পর্কে জানতে চাইলে সোমা বলে, সন্তু পরিবারের দুঃখ কষ্টের সাথে ঘনিষ্ঠ। পরিবারের স্বাভাবিক বন্ধনকে গুরুত্ব দিতে চায়

সোমা। লেখক সন্তুর কথাই আগে জানতে চাইলে সোমা তার ভাবনা জানায়।

গর্ভদৃশ্য- ৩। বাবা রেবার বিয়ে নিয়ে চিন্তিত হলে সন্তু তাঁকে বোঝায়। সে বলে চাকরি ছাড়া আজকাল কেউ বিয়ে করছে না। তাছাড়া বিয়ে দেবার মতো টাকাও তাদের নেই। সন্তু নিজেই রেবাকে বিয়ে দেবে- এই প্রতিশ্রুতি দিলে বাবা আশ্বস্ত হন। সন্তু রেবাকে অবিনাশ রায়ের বাড়ি যেতে বারণ করে দেয়। এদিকে দুই বন্ধুর মধ্যে শান্তনুর টিউশনি চলে গেছে। কারণ প্রায় প্রতিবছর সিলেবাস পাল্টে যাওয়ায় নতুন সিলেবাসের সঙ্গে ধাতস্থ হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিটি ছাত্র তার নিজের স্কুলের মাস্টারমশাইদের কাছে পড়তে চায়। শান্তনু সন্তুকে রীণা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে জানায় প্রেম, স্বপ্ন নিয়ে ভাবার সময় তার নেই। বিনয় সমাজের অবস্থা দেখে অধৈর্য হয়ে ওঠে। শান্তনু ও সন্তু নিজেদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার কথা বলে। রেবার প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সন্তু বলে, '' কেমন যেন অন্যমনস্ক, চুপচাপ থাকে। কে জানে!- গোপনে কাঁদে টাঁদে কি না? সারাদিন এটা সেটা নিয়ে বাইরে থাকি- কিছুই খবর রাখি না।'' এরপর কিছু হালকা কথাবার্তার পর এই দৃশ্য শেষ।

সপ্তম দৃশ্য। লেখকের কাছে সোমার ভাবনাকে বেশ জমাট মনে হয়। তবে গল্পে বাস্তবতার অভাব আছে বলে দাবি করে। তাঁর মতে অসহায়ত্বের জন্য চরিত্রগুলির ক্রোধ জন্মানো উচিত। সোনা মনে করে ক্রোধ সবকিছুকে অস্বীকার করে নয়, তারা সোচ্চার হবে প্রতিবাদে। লেখক জানতে চাইছেন রেবা কীভাবে বাঁচবে?

চতুর্থ অন্তদৃশ্য। শান্তনু ও বিনয় কালীপূজোর রাতে সন্তুর বাড়িতে থাকবে। সন্তু রেবার কাছে কিছু খাবার চায়। রেবা মুড়ি নিয়ে আসে। তাদের কথাবার্তা চলতে থাকে। রেবা সন্তুকে টিউশনি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। কিন্তু কারণ বলে না। বিনয় খেয়ে এসেছে বলে মুড়ি খায় না। কিন্তু শান্তনু মুড়ি খেতে চায়। রেবাকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তার কথা সন্তু তার বন্ধুদের জানায়। এদিকে রেবা আত্মহত্যার চেষ্টা করার সময় সন্তু তার ঘরে এসে হাজির হয়। সন্তু রেবাকে তার আত্মহত্যা করতে যাওয়ার কারন জিজ্ঞেস করলে রেবা বলে ''আমাকে মেরে ফ্যাল দাদা- আমাকে মার। আমি আর বাঁচতে চাই না।'' এতক্ষণে বাবা চলে এলে সন্তু জানায় রেবা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চায়। তার বন্ধুরাও চলে আসে। বিনয় রেবাকে বোঝায়, বাঁচার মধ্যেই সুখ, বাঁচার মধ্যেই আনন্দ। শান্তনু বলে, ' বাঁচতে তো তোমাকে হবেই রেবা।' বাবা বলেন, 'তোদের মার মনে যে তোদের নিয়ে অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন ছিল রে!' সন্তু জানায়, ''এমন একটা সহজ সমাধান খুঁজতে গেলি বোন!- আমি তো ছিলাম। আমার উপর আস্থা রাখতে পারলি না?'' রেবা জানায়, অবিনাশ ওর সর্বনাশ করেছে। বিনয় অবিনাশকে ধরে আনতে চাইলে রেবা বাধা দেয়। সে বলে,''আমি ওকে ঘেন্না করি- ঘেন্না করি।'' রেবা শেষে সবাইকে আশ্বস্ত করে সে বাঁচবে। সে জানায়, ''তোমাদের বুকভরা স্নেহের আশ্রয়ে আমি বাঁচবো...আমি বাঁচবো।''

অষ্টম দৃশ্য সোমার নাটক শেষ। লেখক প্রশংসা করলেও বলেন, 'তবে ওটা গপ্পো- বাস্তব নয়।' অদ্রীশের প্রবেশ ঘটে। লেখক তাকে জানায় সোমার মিলনান্তক নাটকের কথা। রেবাকে বাঁচিয়ে রাখার কথা। ঠিক সেইসময়ই অদ্রীশ একটি খবর দেয়। যে বাস্তব ঘটনার অনুষঙ্গ থেকে লেখক নাটক শুরু করেছিলেন, যে মেয়েটি ছিল কেন্দ্রবিন্দুতে সেই বীণা কাল রাতে আত্মহত্যা করেছে। সুবিনয়বাবুর মতো সমাজের স্বঘোষিত অভিভাবক এক রাজনৈতিক ক্ষমতাবানের

টিপ্পনী

লালসা ও প্রতারণার শিকার হয়ে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। সমাজে বাস করেও আমরা একেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। তাই সমাজের কঠিন বাস্তব সম্পর্কে আমরা উদাসীন ও নিস্পৃহ থাকি।

## রেবা – নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঃ

টিপ্পনী

'জীবনের মানে' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রেবা। নাটকে লেখক ও লেখক-পত্নী সোমার নাট্যভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে রেবা চরিত্রটি দুইভাবে দেখানো হয়েছে। বাস্তব একটি ঘটনার অনুষঙ্গ থেকে লেখকের মনে একটি নাটকের প্লট- এর আইডিয়া জন্ম নেয়। লেখক বীণা নামে ৩৫ বছর বয়সী একটি মেয়েকে বিয়েবাড়ির আনন্দময় পরিবেশে দেখেছিলেন সমাজের সম্ভ্রান্ত মানুষ হিসেবে পরিচিত সুবিনয়বাবুর কাছে চাকরি চাইতে। বাস্তবের বীণাই নাটকে রেবা। লেখকের ভাবনায় প্রথম থেকেই রেবার মধ্যে আত্মহত্যার দিকটি দেখানোর ওপর গুরুত্ব পেয়েছে। কালীপূজোর একটি রাতে নাটকের সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে। সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলেও অবিনাশ রায় বিভিন্ন চোরা কারবারের সঙ্গে যুক্ত। সেই অবিনাশ রায়ের হয়ে কাজ করে রেবার দাদা সন্তু ও দুই বন্ধু শান্তনু-বিনয়। বাড়িতে রয়েছেন মাতৃহীনা রেবার বাবা।

অবিনাশ রায়ের কাছে চাকরি চাইতে যায় রেবা। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েও অবিনাশ তা রক্ষা করে না। আবার রেবাকে ভালোবাসে বললেও অবিনাশ বিয়ে করতে রাজি নয়। বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কের ফলে রেবার মধ্যে একধরণের গ্লানি কাজ করে। প্রথম থেকেই বাবার সঙ্গে উত্তেজক কথাবার্তা বলতে থাকে রেবা। এমনকি সন্তুর সঙ্গে কথাবার্তাতেও সে স্বাভাবিক আচরণ করে না। সামাদিক ও পারিবারিক সমস্ত বন্ধন আলগা হয়ে যাওয়ায় রেবা শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়।

লেখক-পত্নী সোমা রেবাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ায় লেখকের কাছে আপত্তি জানায়। তার মতে মৃত্যুই শেষ পরিণতি হতে পারে না। পরিবারের মানুষগুলোর সঙ্গে বন্ধন সুদৃঢ় থাকলে সে আত্মহত্যা করতে পারবে না। হতাশা ও ক্রোধ প্রতিবাদের রূপ নিতে পারে। আর তাই সোমার নাট্যভাবনায় প্রথম থেকেই রেবার সঙ্গে তার বাবা ও দাদা সন্তুর সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজক কথাবার্তার বদলে সমবেদনা ও সহানুভূতি লক্ষ করা যায়। রেবা আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে বাবা, সন্তু ও তার বন্ধুরা রেবার পাশে দাঁড়িয়েছে। আর তাই শেষপর্যন্ত রেবা বাঁচার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

## নামকরণ ঃ

রেবা- নাটকেরচারিত্র হলেও তার নামে নাটকের নামকরণ হয়নি। আসলে রেবা উপলক্ষ মাত্র। রেবার কাহিনী তার মতো আরও অনেক অসহায় মেয়ের গল্প। 'জীবনের মানে' নামকরণ নাটকের মূল ভাববস্তুর দিকে লক্ষ রেখে করা হয়েছে। একেক মানুষের কাছে জীবনের মানে একেক রকম। নানা সামাজিক-পারিবারিক প্রকিবন্ধকতার মধ্যে পড়ে মানুষ চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে অনেক সময় আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু মৃতের শরীরে জীবন দান করা যেমন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি নিজের জীবন হলেও তাকে হত্যা করার অধিকার মানুষের নেই। যদিও বাস্তবে অনেক সময়ই মানুষ জীবনের কাছে হার স্বীকার করে আত্মহত্যা করতে

এগিয়ে যায়।

লেখকের নাট্যভাবনায় কঠোর ও নিষ্ঠুর বাস্তব প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি জীবনের রূঢ় সত্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু লেখক-পত্নী সোমা পারিবারিক বন্ধনকে এত ঠুনকো মনে করেননি। তার মতে মানুষের সবথেকে চরম বিপর্যয়ের মুখে পরিবারের মানুষগুলোই পাশে এসে দাঁড়াবে। তাই পারিবারিক ভাঙনকে রক্ষা করে তিনি রেবার আত্মহত্যাকে ঠেকাতে চেয়েছেন। কিন্তু মানুষ জীবনে চায় এক, আর হয় অন্যকিছু। আত্মহত্যাই জীবনের প্রতিকূলতা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হতে পারে না। সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করাই জীবনের আসল মানে হওয়া উচিত। সোমা তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে রেবাকে তাই আত্মহত্যার উদ্যোগ থেকে বিরত করে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। মৃত্যু নয় জীবন সেখানে জয়ী হয়েছে।

নাটকের অন্তিম পরিণতি অষ্টম দৃশ্যে এসে নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্ত চমকপ্রদ ও বিস্ময়তার একটি খবরের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। লেখকের বন্ধু অদ্রীশ খবর নিয়ে এসেছে, বীণা নামের একটি মেয়ে কাল রাতে আত্মহত্যা করেছে। এই বীণাই ছিল লেখকের নাট্যভাবনার মূল উৎস। নাটকে জীবনের মানে দুজনের দৃষ্টিতে দুরকম দেখিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত পাঠক ও দর্শকদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। নাটকের মূল বার্তা ও ভাববস্তু অনুসারে 'জীবনের মানে' নামকরণ সার্থক।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

# চতুর্থ একক

## উপন্যাস

## বীরেন দত্তের উপন্যাস 'গ্রামের মেয়ে'

টিপ্পনী

ত্রিপুরার বিশিষ্ট লেখক তথা সাহিত্য- সমালোচক 'গ্রামের মেয়ে' উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন-

'''গ্রামের মেয়ে' উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য যাই থাকুক না কেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।''

উপন্যাসটির সাহিত্যমূল্য আছে কিনা তা বিচার সাপেক্ষ। তবে ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দিক থেকে যে এর গুরুত্ব অপরিসীম যে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর তাই উপন্যাসটির জীবনবৃত্তান্ত জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। কারণ উপন্যাসটির পটভুমি ও বিষয়বস্তু লেখকের ব্যক্তিজীবনকেন্দ্রিক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সেই সঙ্গে ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসঙ্গত উপন্যাসটির ভিত্তিভূমি তৈরী করেছে।

### বীরেন দত্তের জীবনবৃত্তান্ত ও সমকাল ঃ

ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে। ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভূক্ত হয় ১৫ অক্টোবর, ১৯৪৭ সালে। ত্রিপুরা সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অধীন ছিল না। এখানে রাজবংশের শাসন প্রচলিত ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি জনগণ ছিল সংখ্যাগুরু। একে 'স্বাধীন ত্রিপুরা' বলা হতো। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রভাব ত্রিপুরা রাজ্যে পড়েছিল। ওই সময়েই ত্রিপুরার কিছু ছাত্র যুবক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উপাদানসমূহ উপস্থাপন করে গেছেন। বীরেন দত্ত ও আরও অনেকে সেই পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিরিশের দশকে ত্রিপুরায় পার্টি ও গণ আন্দোলন পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনগুলো তাদের চেতনাকে প্রভাবিত করেছিল। অতি অল্প বয়সেই তিনি সন্ত্রাসবাদী ভাবধারা ও সংগঠনের দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য হয়েছিলেন। জীবনে এই পথে চলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন-

''নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার এক অদ্ভূত উন্মাদনা, ভয়লেশহীন নিঃস্বার্থ জীবন দানের প্রবল আবেগ।''

এই আবেগ দ্বারা চালিত হয়েও১৯৩১ সালের কৃষক আন্দোলন তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল। রাজবন্দী হিসেবে হিজলী ক্যাম্পে

আর.এস.পি.পন্থী সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে তিনি প্রথম মিলিতত হন। কিন্তু যখন তিনি দেখতে পান চট্টগ্রামের বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটা বড়ো অংশ জেলখানার কমিউনিস্ট কনসোলিভেশনে যোগ দিচ্ছেন তখন তিনি আর .এস.পি.পন্থী হয়ে যাওয়া অনুশীলন সমিতির নেতাদের প্রভাব মুক্ত হন। তত্ত্বগত সার্বিক মূল্যায়নের বিচারে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার চেতনা তখনও তাঁর জাগেনি।

টিপ্পনী

পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট সাহিত্য নিয়ে তিনি নিয়মিত পড়াশুনা আরম্ভ করেন এবং নিজের কাজকর্ম কোথায় হবে তা ভাবতে শুরু করেন। সেই সময়ে তিনি সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন এঙ্গেল্‌সের লেখা 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' বইটার দ্বারা। এই বইটি উপজাতি প্রধান ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের সম্পর্কে কিছুটা স্পষ্ট ধারণা দিতে তাঁকে সাহায্য করেছিল। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শে ত্রিপুরায় সমাজের অর্তনৈতিক কাঠামো, উৎপাদন ধারা, শ্রেণী সম্পর্ক, উপজাতি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন প্রভৃতি কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত হবার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিরিশের দশকের দিনগুলি উপজাতি জনগোষ্ঠীর সাথে পরিচিত হবার জন্য রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন তিনি। তখনই রাজ্যের শাসন কাঠামো সম্পর্কে এঙ্গেল্‌সের লিখিত তথ্যগুলির প্রমাণ পান।

১৯২৩ সালের ১৪ আগস্ট মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয়। নাবালক বীরবিক্রম কিশোর চার বছর সিংহাসনে আরোহণ করতে পারেন নি। সাবালক হবার পর কাউন্সিলের শাসন অবসান হয় এবং ১৯২৭ সালে তিনি ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে অভিসিক্ত হন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তখন প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি ইতিমধ্যে সন্ত্রাসবাদী নেতাদের সংস্পর্শে চলে এসেছিলেন। ১৯২১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে প্রচার করা হয়েছিল। ১৯২৭-২৯ সালে উমাকান্ত একাডেমিতে পাঠরত অবস্থায় তিনি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। তাঁর বাড়িতেই ব্যায়াম, ছোরা চালানো ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়া হতো। তাঁর অগ্রজ ধীরেন দত্ত, অনুজ জিতু দত্ত ও তিনি নিজে সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা যজ্ঞেশ্বর দত্ত সব জেনেও কখনো বাধা দেন নি। তিনিও স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে গৌরবজনক বলে মনে করতেন। তখন ত্রিপুরার বাইরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, কংগ্রেসি গণ-আন্দোলন, বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি রাজনৈতিক সংগ্রাম চলছিল। এইরকম পরিস্থিতিতে নিজের মানসিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন-

''এইসব ঘাত প্রতিঘাতে আমার চিন্তা দোদুল্যমান ছিল। গণ আন্দোলনে বিভিন্ন ধরনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল এবং গণ আন্দোলনের ওপর একটা অস্পষ্ট বিশ্বাস জাগতে শুরু করেছিল।''

তবে এই পরিস্থিতিতেও সন্ত্রাসবাদী পার্টির শৃঙ্খলা, প্রভাব, রোমাঞ্চকর রাজনৈতিক ডাকাতি, ব্যক্তিহত্যা প্রভৃতিতে তাঁর প্রবলভাবে আচ্ছন্ন ছিল। তখনও তিনি অনুশীলন সমিতির বাইরে আসতে পারেননি। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ার সময় গোপন সংযোগ রক্ষাকারীর দুরূহ ভূমিকাও তিনি পালন করেছিলেন।



১৯৩০ সালে কংগ্রেস স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করার পূর্বেই দেশে যে ব্যাপক গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল তাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। এ সময়ে কুমিল্লাতে কংগ্রেসের ভিতর

থেকে যে অংশ কৃষক আন্দোলন করতেন তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে চলতেন তিনি। কংগ্রেসের অফিসে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। এর ফলে অনুশীলন সমিতির একটা অংশ তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। এই সময়ে তাঁর জীবনে একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রশ্ন প্রবলভাবে উত্থিত হয়েছিল। একদিকে সন্ত্রাসবাদী পথ আঁকড়ে থাকা, অন্যদিকে গণআন্দোলনের মাধ্যমে অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে সারা ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সামিল হওয়া। তিনি কৃষক আন্দোলনগুলির জঙ্গিভাবটিকে সন্ত্রাসবাদী চেতনার সাথে মিলিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

টিপ্পনী

১০ আগস্ট ১৯৩৩ সালে বি. সি. এল. এ. তে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ১৮ আগস্ট ১৯৩৮ সালে মুক্তি পান। বিভিন্ন জেলা এবং গ্রামে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শে দীক্ষিত হন। সেই সময় তিনি সংকল্প করেছিলেন যে আগরতলায় ফিরে এসে শ্রেণী ও গণআন্দোলন গঠন করার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। ১৯৩৮ সালের ১১-১৪ মে কুমিল্লায় যে সর্বভারতীয় কিষাণ সম্মেলন হয়েছিল তাতে আগরতলা থেকে একটি ভালো ডেলিগেশন পাঠানোর অনুরোধ করেছিলেন তিনি। আগস্ট মাসে মুক্তি পেয়ে তিনি সেই ডেলিগেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হন। সকলের পরামর্শক্রমে ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি গঠনের প্রাথমিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই সমিতির মূল দাবি ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং রাজানুগত্যে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা চালু করা। তিনি এই সমিতিতে কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। উপজাতি জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশ ছাড়া ও মণিপুরী ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত স্বল্প শিক্ষিত গ্রামের কৃষক ও এই সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৮-৩৯ সাল ব্যাপী এই জনমঙ্গলের আন্দোলন অতি দ্রুত গ্রাম ও শহরের জাতি উপজাতি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ত্রিপুরায় তখন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনাধীন গনআন্দোলন নির্যাতিত জাতিগত, শ্রেণীগত ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জনজমায়েতের প্রক্রিয়া সাফল্যজনকভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। তাই ত্রিপুরার মহারাজা ১৯৪১ সালের ত্রিপুরা সংবিধান ত্রিপুরার জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব একে প্রতিরোধ ও বর্জন করার আহ্বান জানান। জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হওয়ার পর শহর এবং গ্রামের উপজাতি প্রগতিকামীরা ভাষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও এখই সমিতির পতাকা তলে সমবেত হয়েছিলেন। আমলাদের মধ্যে উদ্‌বাস্তুদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবার পলে রামনগরের মুসলমান কৃষকদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র হয়েছিল এবং মহারাজাকে দিয়ে বিনা ক্ষতিপূরণে মুসলমান প্রজাদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। গণপরিষদ ও জনমঙ্গলের নেতারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে এই স্বাধীনতার স্বরূপ নিয়ে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে প্রচন্ড বিরোধ চলেছিল। নেতৃত্বের বড়ো অংশের মতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারা লব্ধ স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। কাজেই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আপোসকামীদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তোলা এবং দ্রুত গতিতে আক্রমণের দ্বারা প্রশাসনকে অচল করে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি ও অঘোর দেববর্মা প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ৯ অক্টোবর ত্রিপুরার কমিউনিস্ট পার্টির

আর একটি অগ্নিপরীক্ষার দিন এসেছিল। অল্প সংখ্যক পার্টি সদস্য নিয়ে গোলাঘাটি হত্যালীলার মোকাবেলা করতে হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে জনমঙ্গল সমিতির জন্ম হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতির জন্ম হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে প্রজামন্ডলের জন্ম হয়। ১৯৪৮ সালে জন্ম হয় গণমুক্তি পরিষদের। এই আন্দোলনগুলি পিছিয়ে থাকা উপজাতি জনজীবনের অংশ হিসাবে ত্রিপুরার উপজাতি জনজীবনে এনে দিয়েছিল এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সচেতনতা। সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার প্রসার ঘটেছিল।

টিপ্পনী

১৯৪৮ সালে তাঁকে তেজপুর জেলে প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকেই তিনি আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছেন। শিলং জেলে বসে তিনি অনুভব করেন পার্টিকে নির্বাচন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যাওয়া উচিত। আর তাই, জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি 'ত্রিপুরার কথা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি ঘোষণা করেছিলেন। ত্রিপুরা পার্টির মধ্যে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায় তাঁকে শৃঙ্খলা বিরোধী কাজকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করা হয়েছিল। তবে তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। দলের অনেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে বিপ্লবের পথ থেকে সরে যাওয়ার সামিল হিসেবে দের নিয়েছিলেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তিনি যাদের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন–তাদের মধ্যে কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ ছিলেন অন্যতম। তাঁরই নির্দেশে ব্যক্তি–স্বাধীনতার দাবিতে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত পার্টিতে গৃহীত হয়েছিল। এই সময় সবাইকে নিয়ে একটি মোর্চা গঠন করা হয়েছিল। এ বিষয়ে বীরেন দত্ত জানিয়েছেন–

''পার্টির নির্দেশে আমরা যারা জনমঙ্গল সমিতি, জনশিক্ষা সমিতি, প্রজামন্ডল ও গণমুক্তি পরিষদে প্রকাশ্যে চলাফেরা করতেন ও ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি মনোভাবাপন্ন যেসব উদ্বাস্তুগণ ত্রিপুরায় রাজনীতি করতেন তাদের নিয়ে একটা সাধারণ মোর্চা গঠন করেছিলাম।''

১৯৪৯ সালে ত্রিপুরার প্রশাসন মহকুমার শহরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫০ সালের আগস্টে চিফ্ কমিশনার করে পাঠানো হয়েছিল। তিনি একজন জর্জ ছিলেন। এই কারণেই ত্রিপুরার অশান্ত অবস্থা প্রশমনে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য তাঁর ভূমিকাও মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। এ সময়ে দিল্লি থেকে বি.এন. মল্লিক নামে ইনফরমেশন ব্যুরোর প্রধান ত্রিপুরায় এসেছিলেন। চিফ্ কমিশনার হাজরা সব সংগঠনের নেতাদের তার সাথে সাক্ষাৎ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পার্টির পক্ষ থেকে বীরেন দত্তকে আলোচনা করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সাক্ষাৎকারের সময় দেশ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে কিনা–এই প্রশ্ন করলে তিনি জানিয়েছিলেন 'এটা পূর্ণ নয়, এটা ধনিক শ্রেণীর স্বাধীনতা মাত্র।' তিনি জানিয়েছিলেন–

''কমিউনিস্ট পার্টি অবাধ নির্বাচন চায়, ত্রিপুরার বিভিন্ন দলমতের লোক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। এর মধ্যে কোন শর্তের অবকাশ নেই।''

শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। এর ফলে ১৯৫০ সালের ১৪ ফ্রেব্রুয়ারিতে খোয়াই বিভাগে সামরিক শাসনের ঘোষণা প্রত্যাহত হয়েছিল। এই সময় সরকারী কর্মীদের মুখপত্র 'আমাদের কথা' এবং কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ত্রিপুরার কথা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক সংঘ যুক্তভাবে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছিল। এই তালিকায় ছিলেন লোকসভায় পূর্ব ত্রিপুরার কমিউনিস্ট প্রার্থী দশরথ দেব এবং পশ্চিম ক্রিপুরার বীরেন দত্ত। লোকসভার দুটি আসনে এবং রাজ্যসভার একটি আসনে কমিউনিস্ট

প্রার্থী ও কমিউনিস্ট সমর্থিত প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। যে মানুষটির মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল কয়েক হাজার টাকা সেই আত্মগোপনকারী দশরথ দেব জনতার রায়ে নির্বাচিত হয়ে লোকসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সময় নির্বাচনী পরিষদকে বিধান সভায় পরিণত করার দাবি জানানো হয়। নির্বাচনী পরিষদে ৩০টি আসনে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব যুক্তফ্রন্ট পেয়েছিল ২১ আসন। স্বাধীনতার পর প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে নির্বাচিত প্রথম লোকসভার অধিবেশনে দশরথ দেব উপস্থিত ছিলেন। বীরেন দত্ত জানাচ্ছেন–

টিপ্পনী

''সেদিনই হয়তো ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের শেষ ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরার মানচিত্রটি বিশ্বের প্রগতিশীল জনগণের মধ্যে প্রথম পরিচিতি লাভ করেছিল ও তার সংগ্রামী জনগণ এবং সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছিল।''

## কাহিনি বিন্যাস ঃ

বীরেন দত্তর 'গ্রামের মেয়ে' উপন্যাসটি ১৯৩৮–৩৯ সালে লিখিত। উপন্যাসটি বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক নারায়ণ চৌধুরীকে উৎসর্গ করেছেন লেখক। এর কাহিনি সতেরটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। ১৯৩০ সালে কাহিনি শুরু হয়ে ১৯৩৮–৩৯ সালে সমাপ্ত হয়েছে। উপন্যাসের মূল বক্তব্য বিষয়, পরাধীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরায় একটি গ্রামের মেয়ের প্রথাগত জীবনচর্চার বাইরে বেরিয়ে এসে সমাজের অবদমিত শ্রেনীর কৃষক, শ্রমিক, নারীদের জন্য শ্রেনীসংগ্রাম গড়ে তুলে কমিউনিস্টদের সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানসিক উত্তরণ। আর এই উত্তরণের পথে নানা সামাজিক প্রতিকূলতা ও মেয়েদের চিরাচরিত আচারসর্বস্ব বৈবাহিক রীতিনীতি এবং সারাজীবন ধরে পুরুষের দাসীত্ব করার বিরুদ্ধে আন্দোলনও স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়েছে। উপন্যাসটির নায়িকা তথা কেন্দ্রীয় চরিত্র ঊষা হলো সেই গ্রামের মেয়ে যাকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। ঊষা ছাড়াও অন্যান্য যে চরিত্রগুলি উপন্যাসটির কাহিনিকে গতি দান করেছে তারা হলো–সমর গুপ্ত, হরনাথ, ক্ষেমী পিসি, গোবিন্দ, সনাতন, সুরমা প্রমুখ।

প্রথম পরিচ্ছেদে ঊষার পরিবারের জীবনচিত্র ও গ্রাম্য পরিবেশকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। ঊষার বাবা হরনাথ নন্দী দরিদ্র হলেও বংশমর্যাদায় কম নন। তিনি শ্রীকর নন্দীর বংশধর। আই. এ. ফেল করে গ্রামে বর্গা দেওয়া জমির ধানে জীবন শুরু করেন। ম্যাট্রিক পাশ করেই তিনি বিয়ে করেছিলেন। বত্রিশ বছর বয়সে একটি মাত্র কণ্যাকে রেখে তার স্ত্রী মারা যান। এগার বছর বয়সে তাঁর বোন ক্ষেমী বিধবা হয়ে ভুঁইয়াদের অত্যাচারে দাদার আশ্রয়ে দিনাতিপাত করছে। ক্ষেমী পিসি মাতৃহারা ঊষাকে বিশেষ সহ্য করতে পারেন না–

''যে ঊষার তের বৎসর পার হইতেই তাহাকে চক্ষুশূল বোধ করিত। সন্দেহ করিত, অকারণ গালাগাল দিত।''

কুড়ি বছর বয়সের ঊষা গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের মতো প্রথাগত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় নি। তার চিন্তা-চেতনা অনেক বেশি প্রাগ্রসর। বিবাহযোগ্য কণ্যার পিতা হয়ে হরনাথ মেয়েকে নিয়ে সবসময় উৎকণ্ঠিত থাকেন। হরনাথ জীবনে বাঁচার কোনো অর্থ খুঁজে পান না। কারণ ইতিমধ্যেই ঊষাকে নিয়ে ঘরে বাইরে কথা উঠতে শুরু করেছে। ঊষার জীবনদৃষ্টি কিন্তু তথাকথিত

সামাজিক পরম্পরার চাইতে স্বাধীন সত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে বেঁচে থাকার পক্ষপাতি। আর তাই পিতার প্রশ্নের উত্তরে সে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছে–

''আমরা ভদ্র জীব.....আমাদের আচার আছে, সমাজ আছে, ধর্ম আছে....এদের জন্যই তো বাঁচি....বাঁচবার জন্যে বাঁচবার তো কোন প্রয়োজন নেই।''

ঊষার চিন্তাজগৎকে আলোড়িত করেছে শ্যামপাড়ার সমর গুপ্ত। ঊষা তাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। বিয়ে করে দাসীত্বকে বরণ না করে মুক্ত হতে চায়।

টিপ্পনী

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখি মীর গ্রামে ঊষাদের বাড়িতে সমর গুপ্ত ও তার সঙ্গীরা আসে। সেখানে তাঁদের কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়। সমর গুপ্তের বক্তৃতা ঊষাকে অনুপ্রাণিত করে। তারা এমন এক সমাজ গড়ে তুলতে চায় যেখানে–

''শোষক নেই, শোষিত নেই, পাপী নেই, দন্ডদাতা নেই....সতীত্ব যেখানে পুরোহিতের মন্ত্রে পূত হবে না...সতীত্ব হবে অন্তরের সম্পদ....সম্প্রদায়, জাত স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের গন্ডীর ভিতর বেচা কেনা করা নারী জীবনের হবে অবসান।''

ঊষাও ধীরে ধীরে সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের মন্ত্রে দিক্ষীত হয়ে ওঠে। আর তাই গ্রাম্য মেয়েদের বিয়েই জীবনের একমাত্র কামনার বিষয়– এটা যে ঘৃণা করে। পুরুষের যৌনসঙ্গী হয়ে শুধু সন্তান উৎপাদনই মেয়েদের একমাত্র অভিষ্ট হতে পারে না। তার মতে–

''আমরা সমাজ উৎপাদন কাজে অংশ নেই না....তাই সমাজও আমাদের জীবনের দায় হিসাবে উশুল করছে সমস্ত জীবনের ক্রীতদাসীত্ব থেকে।''

তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঊষাদের বাড়িতে সমর গুপ্তরা গোপন বৈঠক করে। ঊষা ক্ষেমী পিসি ও হরনাথের আপত্তি সত্ত্বেও রাতের বেলা সেই বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। বৈঠকে সমর গুপ্ত ছাড়াও উপস্থিত ছিল তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের মুসলমান কৃষক কর্মী ইমাম খাঁ। মজুর শ্রেণী ও গণতান্ত্রিক দেশভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও জমিদারী প্রথাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নেওয়া হয় ওই বৈঠকে। বৈঠকের জ্বালাময়ী বক্তৃতা ঊষাকে নতুন পথের সন্ধান দেয়। ঊষা নিজের কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জানিয়ে তার বাবাকে বলেছে–

''সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি দিওনা বাবা। আমায় একটু স্বাধীনভাবে চলতে দাও....আমি স্বদেশী করব। আমি একটুকু প্রচার করে বেড়াব নারীও মানুষ। তারাও পুরুষের মতই শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞান কর্মে সমশ্রেণীর।''

আর তাই গতানুগতিক সমাজ বিধির দাসত্ব না করে স্বাধীনভাবে বাঁচার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ঊষা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ঊষার বয়স একুশ বছর। সমর গুপ্ত কোলকাতা থাকেন। দীর্ঘদিন সমর গুপ্তের কোনো সংবাদ পায়নি ঊষা। জনৈক কৃষকের কাছ থেকে ঊষা সমর গুপ্তের কোলকাতা থাকার খবর পায়। কৃষকটি তাদের আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন তোলে। জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে সকলে একজোট হওয়া নিয়ে সে প্রশ্ন তোলে। সমর গুপ্তের আদর্শ নিয়েও সে প্রশ্ন তোলে। কৃষিকটির সাথে কথা বলার পর ঊষার মনেও দ্বিধা দেখা দেয়। সে ভাবে –

''সমাজ মুক্তির সংগ্রাম সে কাহাকে নিয়া অগ্রসর হইবে। কেমন করিয়া বন্ধ-দুয়ার জীবন যাত্রার অবসান ঘটিবে। তাহারই বা মুক্তি আসিবে কেমন করিয়া। কত দিনে-''তবে সমর গুপ্তর দেওয়া বইগুলো পড়ে সে ভরসা পায়। এছাড়া সমরের কথা ভেবেও সে প্রেরণা বোধ করে। এদিকে বাড়িতে ক্ষেমী পিসি বিয়ের জন্য জোর করতে থাকে। শেষে ঊষাকে গালমন্দ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। চলে যাবার আগে ঊষা তাকে নিজের মনোভাব বলতে গিয়ে জানিয়েছে-

''মানুষকে সে ভালোবাসতে জানে না,মেয়ে হয়ে মেয়ের ব্যথা বুঝে না-সমাজ তাকে যাই বলুক আমার চোখে কুলটার চেয়েও অধম।''

টিপ্পনী

পঞ্চম পরিচ্ছেদে পুরোহিত রাম রতন ভট্টাচার্য ও জমিদার হেমন্ত ভুঁইয়া হরনাথের পারিবারিক ব্যাপারে পরামর্শ দিতে আসে। ঊষার বিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ উ--পন করলে তাদের আদালতের ভয়

দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয় সে। এদিকে পিতা হরনাথকে নিয়ে ঊষা দুই বছর ধরে অত্যন্ত মর্মপীড়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। হরনাথ অসুস্থ হলেও দুই বছরে একবার মাত্র ইমাম খাঁ ছাড়া কেউ খোঁজ নিতে

আসে নি। এদিকে পুলিসের জুলুমে আন্দলনে ভাঁটা পড়েছে। কৃষকদের কোনো দাবি পূরণ হয় নি। তার বাবা যখন মৃত্যুপথযাত্রী তখন গোবিন্দ নামে এক হাল চাষাকে পাঠীয়ে দেয় ইমাম খাঁ। চৌদ্দ-পনের

দিন রোগে ভুগে হরনাথ মারা যায়। কিন্তু তাদের জাতের কোনো কায়স্থ লোক শবকে দাহ করতে আসে নি।

ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ। ঊষা আজ সম্পূর্ণ একাকী। একাকীত্ব তাকে সিদ্ধান্তহীনতায় ডুবিয়ে দিয়েছে। এই নিঃসঙ্গতাকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না-

''একবার এমনও মনে হইল ঃ না,ক্ষেমারই ত্রুটি। একটা বিবাহ দেখিলেই ভালো হইত। সে যেন এই রাত্রিটি কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না।''

বাবার মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ ঊষা রাত্রি শেষ হয়ে প্রভাতের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ভোরবেলা পুলিশের লোক এসে হাজির হয় সমর গুপ্তর সন্ধানে। সমর গুপ্তকে আশ্রয় দেওয়া যেমন অপরাধ তেমনি তাদের সাথে মিলে গুপ্ত হত্যা,ষড়যন্ত্র,লুঠতরাজ চালানোও অপরাধ। গামের জমিদার ও অন্যান্যরা তাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছে। একথা শুনে ঊষা আবেগমথিত কণ্ঠে বলতে থাকে-

''মিথ্যে কথা খুন আমি করতে যাব কেন--। খুন করেছে জমিদার,খুন করেছে আমার পিতাকে, খুন করতে চায় আমার আত্মাকে-আমি মরতে রাজি নই-আমি মরব না-।''সমর গুপ্ত সাম্যবাদী সমাজ গড়তে চায়,দুর্গত বাংলাকে শ্রেণিহীন,শোষণহীন করতে চায়। পুলিশ ঊষার ঘরে কিছুটা তল্লাসী করে চলে যায়। সমর গুপ্তর মতো পুলিশের খাতায় দোষীদের তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তাদের মধ্যে একজন হলো সনাতন। ঊষা ভাবতে লাগল,সে এখন সহজেই সনাতনের বাড়ি যেতে পারে।আর কোনো ভয় থাকে আটকে রাখতে পারবে না। সমর গুপ্ত যদি ফিরে না আসে ,যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় তাহলে সে কী করবে। আন্দলন তো থামিয়ে

রাখা চলবে না-

''সে সচ্ছন্দে চাষীদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে পারে- তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ হইতে সংগ্রাম করিতে উৎসাহিত করিতে পারে- ইহা মানুষেরই কাজ। সে নারী হইলেও মানুষ।''

নতুন উদ্যম নিয়ে ঊষা নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ। ঊষা সনাতনের বাড়িতে এসে হাজির হয়। বাড়িতে পুলিশ আসার ঘটনা সনাতনকে জানায়। সনাতন তথাকথিত অর্থে শিক্ষিত না হলেও কীভাবে জমিদার, মহাজন,জোতদার,বর্গাদাতাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে চাষী সংঘ গড়ে তুলে কৃষক ও চাষীদের অধিকার আদায় করা সম্ভব সে সম্পর্কে ঊষাকে সজাগকরে তোলে। খুনের কথা শুনে ঊষা ভয় পেলে সনাতন জবাব দেয়-

''কিন্তু দেশের জন্য, কৃষক সমাজের জন্য অনেক রক্ত দিতে হবে। রক্ত দানের ক্ষেত্রে শত্রুর রক্তও তো কিছু ঝরবে--''সনাতন গুপ্ত পুলিশের চোখ এড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাই এ অঞ্চলে আসা হয় না। সনাতন কুমিল্লায় কৃষকদের ওপর অত্যাচার হলেও যে তারা আত্মসমর্পণ করেনি সেই ঘটনা ঊষাকে শোনায়। সন্ধায় সে ঘরে ফিরে আসে। সনাতনের কথায় সে অনেকটা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এই আন্দলনের সঙ্গে সে যেন নাড়ীর যোগ খুঁজে পেয়েছে। আর তাই আগের মতো নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে না নিজেকে। ঘরে বসে সনাতনের কথাগুলো মনে করছে সে-

'' বিদ্যার অর্থ কি --যে বিদ্যা মানুষকে গোলাম করে রাখে,মানুষকে শোষণ করে-জানোয়ারের মতো খাটায়,যে বিদ্যা যুগ যুগ বাংলাকে মূর্খ দরিদ্র নিপীড়িত করে রেখেছে ওই বিদ্যার সাথে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের বিদ্যার মিল কোথায়--

সমস্ত শোষিত,বঞ্চিত কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির. সঙ্গে ঊষা একাত্মবোধ করে। তার মনে হয় নিখিল বিশ্বে এত বন্ধু থাকতে নিজেকে সে নিঃসঙ্গ মনে করছিল। সমর গুপ্ত তাকে কাজ করতে বলেছে। সনাতন তাকে কাজ করে যেতে বলেছে। কাজ করতে করতেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একদিন সব লিখে যাবে সে। আজ ঊষারও মনে হচ্ছে-

''মৃত্যুদূত সম পুলিশ আসিয়াই যেন, তাহাকে বলিয়া গেল-ওরে মূঢ় মেয়ে-বাঁচবি তো কাজে ঝাঁপ দে, মুক্তির কাজে উন্মত্ত গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়-।''

অষ্টম পরিচ্ছেদ।বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের সঙ্গে ঊষা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছে।রান্নাবান্না করে বাকি সময় সংবাদপত্র ও বই পড়ে সময় কাটে। এছাড়া রাত্রে সনাতন, রহিম,ইমাম খাঁ মাঝে মাঝে আসে। কৃষক, চাষী, শ্রমিকদের সমস্যা,মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া,সংবাদ ছাপার জন্য লিখে দেওয়া ইত্যাদি কাজ চলতে থাকে। ছোটো ছোটো ঘটনাকে সুন্দর ও আবেগ ভরা ভাষায় লিখে দিতে ঊষা সিদ্ধহস্ত। সনাতন ঊষার এই কাজের প্রশংসা করে। তবে তার একটা আক্ষেপও আছে-

''কেবলই মনে হয় সমর গুপ্ত আসে না কেন? সে কেন আসিয়া দেখে না আজ ঊষা নন্দী সত্যই কাজ করিতেছে।''

১৯৩২ সালের আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে।সনাতন ও অন্যান্যরা অনেক প্রকাশ্যে চলাফেরা করে । কিন্তু ১৯৩৩ সালে পুলিশের নির্যাতন বেরে ওঠে। সনাতন, রহিমরা আর সন্ধার পর

টিপ্পনী

বাড়ি থেকে বের হয় না। সমর গুপ্ত ও ইমাম খাঁ ফেরারী। পুলিশ তাদের সন্ধান করছে। সমাজে সভা ও বৈঠক অনেক কমে গেছে।

নবম পরিচ্ছেদ ।হঠাৎ সমর গুপ্তর আবির্ভাব। একদিন রাতে ঊষার ঘরে সমর গুপ্ত হাজির হয়। ব্যক্তিগত দুএকটি কথার পর পুলিশের অত্যাচার নিয়ে তাদের কথাবার্তা হয় ।কিছুক্ষণ পর সমর নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার কথা বলে বিদায় নিতে চাইলে ঊষা আশাহত হয়। কারণ-

''তাহার যে কত কথা বলিবার রহিয়াছে। একটি রাত্রে কেন- শত শত রাত্রিতেও তাহা শেষ হইবে না'' এমন সময় ঊষার লেখা একটি কাগজ নিয়ে সমর পড়তে থাকে। পড়া শেষ হলে উল্লসিত হয়ে সমর ঊষাকে জড়িয়ে ধরে আবেগ মথিত কণ্ঠে বলতে থাকে-'' ঊষা, ঊষা তুই আশ্চর্য -তুই মহামতী প্রতিভাশালী মেয়ে।''

টিপ্পনী

ঊষা যে দলের মূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠেছে সে ব্যাপারে সমরের মনে কোনো সংশয় থাকে না। তবে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে হলে তো তাকে গ্রাম ত্যাগ করতে হবে। ঊষা কিন্তু গ্রাম ছেড়ে পালাতে চায় না। এখানে থেকেই গ্রামের মানুষের বুকে সাহস ও সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে চায়। অবসর সময় সে চরকা নিয়ে বসে। সমর গুপ্ত চরকা নিয়ে আপত্তি তুললে ঊষা জানায়-

''আমি লোককে চরকা কাটতে বলি বটে,তবু কখনও বিশ্বাস দেই না- এ দেশের স্বরাজ আসবে। বরং স্বরাজ আমার মনে তোমাদের মত প্রথম কথা আজও হয়ে উঠেনি। আমি যে নির্যাতন ওমোহের ভিতর বাস করছি, যে ভুলে এমনভাবে শত শত নারী নিজেদের সর্বনাশ করে মেয়ে বংশকে তারই উত্তরাধিকার দিয়ে যায়- তারই কথা বলি।'

ঊষার দৃঢ়তাভরা এই কথাগুলো সমর গুপ্তকেও ভাবিয়ে তোলে ।ঊষার এতদিনে অনেক রুপান্তর ঘটে গেছে। সে অনেক চেতনা সম্পন্ন হয়েছে। আর তাই ঊষার মতো দশটি মেয়েও যদি পার্টিতে থাকত

তাহলে অনেক উপকার হতো বলে সমর মনে করে। ঊষার চিন্তাধারায় সমর গর্ব অনুভব করে ।গ্রামের নারীদের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার চলে তা কখনও সমরদের চতেনাকে আলোড়িত করে না। আর তাই ঊষার কমিউনিষ্ট কর্মী হওয়া আর গ্রাম ছেড়ে না যাওয়ার কারণ ভিন্ন। সে জানিয়েছে-

''মধ্যবিত্ত বল, কৃষক বল, দীন মজুর বল, গ্রামের মেয়েরা মানুষই যেন নয় ।একে হত্যা করা চলে, বেচা-কেনা চলে, মুখফুটে প্রতিবাদ করবার এতটুকু শক্তি নেই।''

আর তাই গ্রামের মেয়েদের মুক্তিলাভের বিশ্বাস জাগিয়ে তোলাও তার লক্ষ্য। সমর গুপ্ত ঊষার কথা শুনে বুঝতে পারে সেও একটা নির্বোধ ধারণা নিয়ে ঊষার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল ।এরপর সমর কোনো এক অপরিচিত কৃষক বাড়ির সন্ধানে বেড়িয়ে যায়। আজ ঊষার এক নতুন উপলব্ধি হয়েছে ।নিজের মতামতকে সে সমর গুপ্তর মনে স্বীকৃতি দান করাতে পেরেছে। আর তাই সমস্ত বাংলার জন্য সে এক অনাবিল দেশপ্রেমের আনন্দে রোমাঞ্চ অনুভব করছে।

দশম পরিচ্ছেদ। পুলিশের চোখ এড়িয়ে সমর গুপ্ত মীর গ্রামে পৌছয়। সনাতন ঊষাকে সাবধান করে দিয়ে যায় পুলিশ এলে যেন সমরের আসার খবর না দেয়। পরিহাসছলে

ঊষা জানায় সে মিথ্যে বলতে পারবে না। সনাতন ব্যগ্র হয়ে জানায় মেয়েদের নিয়ে আন্দোলন চলে না-তারা বোঝে না। উষা প্রত্যুত্তরে জানায়-

''এত বোকা ভাবলে ভার দিয়েছিলে কেন সনাতনদা। সেবার ছিল কমিউনিজম একটা আবেগের বিষয়,সমর গুপ্ত ছিল একটা স্বপ্ন মানুষ - আমি ছিলাম একটা কল্পনার উপাসক মাত্র। আজ আর আমি তেমনটি নই।''

টিপ্পনী

এদিকে খবর আসে সমর গুপ্তকে গ্রেপতার করে সদরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গ্রামের দুইশত লোক জড়ো হয়েছে। সনাতনও সেখানে এসে হাজির হয়। সমর সনাতনকে সংঘ গড়ার দায়িত্ব দিয়ে পুলিশের সঙ্গে চলে যায়।জেলে সমর গুপ্তের স্থান হয় রাজবন্দী হিসাবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ। জেলের ভিতরেই অন্যান্য বন্দীরা সমর গুপ্তকে ব্রিটিশের দালাল বলতে থাকে। সমর গুপ্ত জেলে যাবার পর এক অজানা দুঃখ ঊষাকে গ্রাস করে। অব্যক্ত অস্বস্তি ও বেদনা সত্ত্বেও সে নিজেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছিল এই বলে -

''ছিঃ ছিঃ ব্যক্তিগত কামনার জন্য এমন দুঃখ। এই দুঃখ তো দেশপ্রেম নয়। আমি কি শিখিয়াছি ? কিছু না--- গাঁয়ের মেয়ে মরিলেও স্বভাব যাইবে না।''

এদিকে গ্রামে বসন্ত ও কলেরার মড়ক লেগেছে।কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি। সনাতন গ্রামের মানুষের সাহায্যের জন্য, ঔষধপত্রের জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যার্থ হয়েছে। সারাগ্রাম উজার হবার জোগাড়। কোলকাতার অট্টালিকা,ঔষধের কারখানা যারা তৈরী করেছে তাদের বিপদে কেউ এগিয়ে আসে নি। আর তাই এই সমাজব্যবস্থার ওপর সনাতনের বিতৃষ্নার প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে -

''অভিশাপে বিশ্বাস নাই, তবুও দিয়াছে - নিপাত যাউক এই ভন্ড সভ্যতা। ইহারা মানুষকে এইটুকুও মনুষ্যত্ব দেয় নাই- দিয়াছে হৃদয়হীনতা - নিষ্ঠুরতা ।''

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। ঊষা রাজবন্দীদের মুক্তি নিয়ে সনাতনের সঙ্গে আলোচনা করে। ওদের জন্যই, ওদের আত্মত্যাগের জন্যই ছাপাখানার স্বাধীনতা মিলেছে, মন ও মত প্রকাশের পথ খুলে গেছে। আর তাই সংঘ ও সংহতির মাধ্যমে সংগ্রামে সামিল হতে হবে। ঊষার মতে -

''জনতাকে সংঘবদ্ধ করাই বিপ্লবজয়ের প্রধান সংগ্রাম - জাতীয় একতা গড়ে তোলাই জাতীয় মুক্তির একমাত্র সত্য পথ।''

ঊষার কথায় সনাতন এক নতুন সত্য উপলব্ধি করে। চারিদিকে সমস্ত উত্তেজনা ও আন্দোলন যখন শ্লথ হয়ে এসেছে তখন ঊষা বন্দী মুক্তি আন্দোলন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প নেয়। সাত মাস ধরে সমর গুপ্ত জেলে বন্দী অবস্থায় রয়েছে। প্রতি মাসেই কর্মসংযোগ শিথিল হয়ে পড়ছে। অথচ উষা সমরকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। ঊষার কথায় সনাতন রাজবন্দী মুক্তিসভা ডাকার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। বৃদ্ধ কৃষক আরকান খাঁ সেই সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। ঊষা সেই সভায় বক্তৃতা দেয়। বক্তৃতায় সে জানায় গণতান্ত্রিক অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা না থাকলে কৃষক সমাজকে সংঘবদ্ধ করা যাবে না। আর তাই বন্দী মুক্তি আন্দোলন ও কৃষক মুক্তির আন্দোলন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। বক্তৃতা শেষে ঊষা এক নতুন শক্তি নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। ঘরে ফিরে সভার বিবরণী এক

জাতীয়তাবাদী কাগজ ও জেলা কৃষক অফিসে প্রেরণ করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। সভায় ঊষা নন্দীর বক্তৃতার সংবাদ জেলা অফিসের একজন কমিউনিস্ট কর্মীর হাতে পৌঁছয়। তারা ঊষাকে জেলা অফিসে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান। ঊষা দেখতে দেখতে ঊনত্রিশ বছরে পৌঁচেছে। একদিন যে ঊষা গ্রাম ত্যাগ করতে চায় নি সে-ই আজ গ্রামের বাইরে যাবার প্রস্তাব গ্রহণ করে নিল। গ্রামের মেয়ে হয়েও ঊষা উপলব্ধি করতে পারছে যে মেয়েরা উদ্ধারের বা মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। দাসী দুর্লভ জীবনের কোনো মানে হয় না। শুধু গ্রাম নয় শহরের মেয়েরাও প্রেমের বোধটুকু হারিয়ে ফেলেছে। তবে গ্রামের মেয়েরা আমৃত্যু যেভাবে পরিশ্রম করে, যে আত্মত্যাগ করে তা অন্যান্যরা ভাবতেও পারে না।

টিপ্পনী

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। ঊষা শহরে এসে পৌঁছয়। নারী বৈঠকে ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে সে বক্তৃতা দেয়। আলোচনার বিষয়বস্তু সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা। তার মতে, সমাজতন্ত্র মানে সকল প্রকার দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বিয়ে করে পতিদেবতার দাসীত্ব আর প্রেম করে প্রিয় দেবতার দাসীত্ব - মন থেকে এই দাসীত্ব প্রথাকে লোপ করাই মেয়েদের সমাজতন্ত্র শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এক ছাত্রী ইকোনমিক্স অথবা 'ফিলজফি অব সোসালিজম' সম্পর্কে আলোচনা করতে বললে ঊষা রূঢ়ভাবে বলে ওঠে -

"আমি যা বলছি, ওটাই সমাজতন্ত্রের ফিলজফি। সংগ্রাম করবার প্রেরণা সঞ্চারই কার্লমার্ক্সের দর্শন। বসে বসে ভাব বিলাসিতা এই দর্শনের শত্রু।"

মেয়েদের শুধু সন্তান ধারণের যন্ত্র হয়ে পুরুষের যৌন দাসীত্ব করলে চলবে না। বিপ্লবের জন্য এমন কি সমাজ উৎপাদন ক্ষেত্রে মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও মেয়েদের ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। আর তাই ব্যক্তিস্বার্থপরতা ও ফ্যাশানের প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মার্ক্সীয় দর্শনের মূল শিক্ষা হলো জীবন অভিব্যক্তির কাজে সকল বাধা চূর্ণ করা। নারী বৈঠকের এক ছাত্রী তার বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলে সে জানায় -

"জানতো আমি গ্রাম থেকে এসেছি। বড় নির্মম যন্ত্রণা আপন জীবনের উপর দিয়ে গেছে। আমার বর্তমান সংগ্রামী জীবনের পথে বাঁধা জন্মায় এমন কোন পুরুষকে আমি বিয়ে করতে অনিচ্ছুক।"

এদিকে সমর গুপ্ত জেল থেকে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। বিপ্লবের কাজে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই খবর ঊষাকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছে। এই শহরে সে এক জেলা হাসপাতালের ডাক্তারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। ডাক্তার-পত্নী সুরমা তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ঘরে ফেরার পর সুরমাই তাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে সমর একদিন ঠিক-ই ফিরে আসবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। সুরমা ঊষার কাছ থেকে সমরের ঠিকানা ও আদ্যোপান্ত সব ঘটনা জেনে নেয়। এরপর সমর গুপ্তর উদ্দেশে পত্র লিখতে বসেন। পত্রে ঊষার শিক্ষা ও সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞানের কথা উল্লেখ করে জানান -

"তাহার অন্তর দর্পণে এই সত্যটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে.... নারী একবার যাহাকে অন্তর দিয়া জীবনসাথী করিতে গ্রহণ করিয়া ফেলে তাহার জীবৎদ্দশায় অন্যকে গ্রহণ করিতে পারে না।

প্রাণের বিবাহ অন্তরের বিবাহ চির সত্য।"

পত্রটি যথা সময়ে সমর গুপ্তর হাতে আসে। পত্র পড়ে সে অত্যন্ত লজ্জিত হয়। সন্ধ্যার পরে সে মীর গ্রামে ঊষাদের শূন্য উঠানে গিয়ে দাঁড়ায়। পূর্বের সব ঘটনা মনে করে সে নিজের ভুল বুঝতে পারে। পরদিন সকালে সুরমার উদ্দেশে সে একটি পত্র লিখল। নিজের ভুলের জন্য অনুশোচনা ব্যক্ত করে সে লিখেছে –

টিপ্পনী

"একদিন সে আমাকে শ্রদ্ধার অঞ্জলী দিত, তখন আমি এই বলিয়াই দুঃখ করিতাম, আমার সমপর্য্যায়ে সে নাই .... আজ হয়ত সেও ভাবিবে ... আমারই মতন ভাবিবে ইহাতে তাহার অন্যায় কিছু নাই।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ। ঊষা আপন মনে বিভিন্ন সভা, সমিতি, পল্লী নারী সংগঠন প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থেকে সমর গুপ্ত সম্পর্কে একটা সত্য হেয় বোধ উপলব্ধি করে। সুরমা তাকে সমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেন। সেইসঙ্গে একথাও বলেন, মানুষকে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় হতে হয়, সচেষ্ট হতে হয়। শেষ পর্যন্ত সুরমার কথাকে ঊষা অস্বীকার করতে পারে নি। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে গ্রামে যাবার সংবাদ সুরমাকে দিয়ে সমরের কাজে পাঠালো ঊষা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। পার্টির অনুমতি নিয়ে আজ প্রায় এক বছর পর ঊষা গ্রামের উদ্দেশে পা বাড়ায়। সে যেন – নিজের অস্তিত্বের ভিতর একটি সমগ্র মানব ধারা প্রবাহের উৎস অনুভব করছিল। তার মনে হতে লাগলো –

"সার্থক এই পৃথিবীতে বাঁচা.... জন্ম মৃত্যুর মাঝখানে কর্মবীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া মুক্তির আনন্দে ছুটিয়া চলার চাইতে আর কি সুখ থাকিতে পারে... কাজ করিয়া মরণেও সুখ আছে।"

সমর গুপ্ত সনাতনের কাছে গিয়েও নিজের ভুল পথে চলে যাবার কথা স্বীকার করে। এরপর পুনরায় ঊষার বাড়ির শূন্য উঠানে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখানে বসে নতুন করে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হবার কথা চিন্তা করতে থাকে। এমন সময় ঊষা এসে উপস্থিত হয়। সে গড় হয়ে সমরকে প্রণাম করে। সমর ঊষাকে জানায় তার মূর্চ্ছ ঊষাই ভাঙিয়েছে। সাতদিন ধরে গ্রামের জীবনে নারী সংগঠন, কৃষক সংগঠন, গ্রামের কুটির শিল্পী, তাঁতী সংঘ, কামার সংঘ, সুতার সংঘ প্রভৃতি বিষয়ে দিবারাত্র আলোচনা চলে। সেইসঙ্গে বিবাহিত ঊষার প্রেম ও শ্রমের পূর্ণাঙ্গ জীবনানুভবও পাশাপাশি চলে। সাতদিন পর গ্রামের দায়িত্ব নিয়ে সমর থেকে যায় আর ঊষা শহরে ফিরে যায়। এরপর এক বছর সময়ের মধ্যে কেবল এক বৈঠকে এক বার মাত্র তাদের দেখা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের তান্ডব থেকে দরিদ্র বাংলাকে রক্ষা করার জন্য তাদের ব্যস্ততাও বেড়ে গেছে। সেই ব্যস্ততার মাঝেই একদিন ঊষা সমরের উদ্দেশে এক গোপন পত্র লেখে। সেই পত্রে নারী-সমিতি ও অন্যান্য কাজকর্মের কথা উল্লেখ করে। সমরের পলায়নের সংবাদ সে পেয়েছে। কিন্তু তাদের স্থানিক দূরত্ব দূর হয়ে একে অপরের কাছাকাছি এনে দিয়েছে জীবনের ব্রত। ঊষার অনুভবেই তা স্পষ্ট –

"প্রতি কাজে প্রাণ জাগিয়া উঠে .... প্রতি জাগরণে তোমার স্পর্শ জীবন্ত হইয়া উঠে? তুমিও কি তেমনি অনুভব কর? মন জানিতে চায়।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

ঊষার এই পত্রের মধ্য দিয়ে, সমরকে করা এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে।

## চরিত্র বিচার ঃ

### ঊষা ঃ

ঊষা 'গ্রামের মেয়ে' উপন্যাসের নায়িকা তথা প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই চরিত্রকে আবর্তিত করে বাকি চরিত্রগুলি কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এক গ্রামের মেয়ের চেতনার বিকাশ ও জীবন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত অত্যন্ত নৈপুন্যের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন লেখক। আর তাই লেখক স্বয়ং কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাসটি নিছক রাজনৈতিক সমীকরণে সীমাবদ্ধ থাকে নি। রাজনৈতিক ভাবনা, বিভিন্ন আন্দোলন ও বিপ্লবী চেতনাকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে জয় করে এক গ্রামের মেয়ের উত্তরণের কাহিনি হলো 'গ্রামের মেয়ে' উপন্যাস। আর এই গ্রামের মেয়ে হলো মীর গ্রাম নিবাসী নন্দীর মে. মাতৃহীনা ঊষা। গ্রামের তথাকথিত সংস্কার ও বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ঊষা কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। শেষে বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত করে, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে দলের নেত্রী হিসেবে নিজেকে উন্নীত করেছে। এই জায়গায় পৌঁছনোর পথ কুসুমাস্তীর্ন ছিল না। অনেক আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের মধ্য দিয়ে দলের দায়িত্ব নিজ হাতে নেবার অধিকার অর্জন করেছে।

এই উপন্যাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাকেও তুলে ধরা হয়েছে ঊষা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। গ্রাম শহর নির্বিশেষে মেয়েদের স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে যে অসাম্য সমাজে প্রশ্রয় পেয়ে আসছে তার বিরুদ্ধে ঊষা এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। মেয়েদেরকে যে সমাজে মানুষের মর্যাদা না দিয়ে শুধুমাত্র পুরুষের দাসীত্ব করার জন্য এবং সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, সেই সমাজের বিরুদ্ধে ঊষার উচ্চ কণ্ঠে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে। সামাজিক উৎপাদনেও যে মেয়েদের ভূমিকা রয়েছে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে যে মেয়েদের সমান অধিকার দেবার প্রয়োজন রয়েছে তা বিভিন্ন সময়ে ঊষার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া মেয়েরা যে কোনো অংশে কম নয়, এমনকি বিপ্লব, আন্দোলন, দল পরিচালনা সব ক্ষেত্রেই যে মেয়েরা নির্ভরযোগ্য, সুযোগ পেলে তারাও যে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে তা ঊষা তার নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছে। আমরা বিভিন্ন সময়ে ঊষার নানা বক্তব্যকে তুলে ধরে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও রূপান্তরকে তুলে ধরার চেষ্টা করব –

১) আমি বিয়ে করব না। আমি মুক্ত হব। জানি তোমরা ঘৃণা করবে, অবিশ্বাস করবে, কর ক্ষতি নেই, তবুও আমি আর মরতে চাই না।

২) আমরা জন্ম নেই.... তারপর হাঁস কবুতরের মত বিক্রী করা স্বামীর ঘরে বাচ্চা পাড়তে চলে যাই.... সমস্ত জন্মটা ক্ষয় করে ফেলি.... আত্মার এই অপমৃত্যু কত করুণ কেমন নিষ্ঠুর।

৩) এই বিয়ে ব্যবস্থাটাই জঘন্য... তোদেরও মনকে বিষিয়ে তোলে... কামনা ছাড়া... পুরুষের যৌনসঙ্গ ছাড়া জগতে কিছু কাম্য হতে পারে.... বিয়ে করা মেয়েগুলি ভাবতেও পারে না।

৪) বাবা তুমি আমার জন্ম দিয়েছ, হত্যা করোনা....। সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি দিওনা বাবা। আমায় একটু স্বাধীনভাবে চলতে দাও... আমি স্বদেশী করব। আমি এতটুকু প্রচার করে বেড়াব নারীও মানুষ। তারাও পুরুষের মতই শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞান কর্মে সমশ্রেণীর।

টিপ্পনী

৫) আমাদের মেয়ে জাতটাই মেয়েদের পরম শত্রু। তারা দাসীপনা বৃত্তিতে এমন সম্মোহীত হয়ে গেছে... মুক্তির ছায়ামাত্র সহ্য করতে চায় না।

৬) জগৎব্যাপী মানব মুক্তির তুমুল প্রবাহ এসে গেছে, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

৭) মানুষকে যে ভালবাসতে জানে না, মেয়ে হয়ে মেয়ের ব্যথা বুঝে না – সমাজ তাকে যাই বলুক আমার চোখে কুলটার চেয়েও অধম।

টিপ্পনী

৮) মনের মত মানুষকে বিয়ে না করে কবুতরের পোষা খাঁচায় প্রবেশ করিতে লজ্জা হয়।

৯) আমরা কাজের ক্ষেত্রে এক। মাঠে নামলে সকল কৃষকই চাষী। কলে-ফ্যাক্টরীতে সকল মজুরই শ্রমিক।

১০) আমি লোককে চরকা কাটতে বলি বটে, তবু কখনও বিশ্বাস দেই না – এ থেকেই স্বরাজ আসবে।

১১) এত বোকা ভাবলে, ভার দিয়েছিলে কেন সনাতনদা। সেবার ছিল কমিউনিজম একটা আবেগের বিষয়, সমর গুপ্ত ছিল একটা স্বপ্ন মানুষ – আমি ছিলাম একটা কল্পনার উপাসক মাত্র। আজ আর আমি তেমনটি নই।

১২) জনতাকে সংঘবদ্ধ করাই বিপ্লবজয়ের প্রধান সংগ্রাম – জাতীয় একতা গড়ে তোলাই জাতীয় মুক্তির একমাত্র সত্য পথ।

১৩) এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন বন্দী মুক্তি আন্দোলন আর কৃষক মুক্তির আন্দোলন এক সূত্রে গাথা।

১৪) হইনা কেন গ্রামের মেয়ে.... আমারও শক্তি আছে। আমার লাঞ্ছনা আমাকেই দূর করতে হবে।

১৫) গাঁয়ের মেয়ে হয়েও বুঝতে পারছি এতে শান্তি নেই.... এই দাসী সুলভ জীবনের কোন অর্থই হয় না.... উদ্ধারের পথ খুঁজে পাচ্ছে না.... শহরের মেয়েরা প্রেমের রোশনাইয়েও বোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছে।

১৬) সমাজতন্ত্র মানে সকল প্রকার দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এই যেমন আমাদের মেয়েদের ধরা বাধা দাসীত্ব... বিয়ে করে পতিদেবতার দাসীত্ব.... প্রেম করে প্রিয় দেবতার দাসীত্ব.... মন থেকে এই দাসীত্ব প্রথার শেষ চিহ্ন লোপ করাই মেয়েদের সমাজতন্ত্র শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য।

১৭) ক'জন বিপ্লবের জন্য এমন কি সমাজ উৎপাদন ক্ষেত্রে নরনারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য.... পুরুষের সমমর্যাদা লাভ করবার জন্য অন্তরের তাগিদ অনুভব করেন?

১৮) মার্ক্সীয় দর্শনের আদি ও মূল শিক্ষা জীবন অভিব্যক্তির কাজে সকল বাধা চূর্ণ করা।

১৯) জানতো আমি গ্রাম থেকে এসেছি। বড় নির্মম যন্ত্রণা আপন জীবনের উপর দিয়ে গেছে। আমার বর্তমান সংগ্রামী জীবনের পথে বাধা জন্মায় এমন কোন পুরুষকে আমি বিয়ে করতে অনিচ্ছুক।

২০) সার্থক এই পৃথিবীতে বাঁচা... জন্ম মৃত্যুর মাঝখানে কর্মবীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া মুক্তির

আনন্দে ছুটিয়া চলার চাইতে আর কি সুখ থাকিতে পারে... কাজ করিয়া মরণেও সুখ আছে।

ত্রিপুরার বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক ঊষা চরিত্রটি বিচার করতে গিয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তাঁর আলোচনায় তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে -

"গ্রামের মেয়ে বলতে সাধারণত মনের মধ্যে যে ছবি ভেসে ওঠে, এই উপন্যাসের মূল চরিত্র ঊষা মোটেই সেরকম নয়। জীবনের সমস্ত বাধা-বিপত্তি দলন করে দুর্বার সংকল্পে এগিয়ে চলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে আলেখ্য তাকে রীতিমত বৈপ্লবিক বলা যেতে পারে। আমাদের গ্রাম ঘরের মেয়েরা যদি ঊষার মতন সংকল্পের তেজ, বাধা জয়ের শক্তি লাভ করতে পারতো তাহলে এ দেশের চেহারা অন্যরকম হতো। ঊষার জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ শুধু তাঁর নিজেরই প্রতিষ্ঠা লাভ নয়, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ। সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে তাদের হয়ে লড়াই করতে করতে ঊষার ব্যক্তিত্বের রূপান্তর ঘটে - যে ছিল নিছক এক অশিক্ষিতা সংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ গ্রামের মেয়ে সে ক্রমে হয়ে ওঠে এক পরিপূর্ণ সম্বিতপ্রাপ্ত শিক্ষার আলোকে আলোকিত সমাজ-সচেতন নেতৃত্বগুণসম্পন্ন নারী। সংগ্রাম ও প্রাগ্রসর মনোভাবের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এইভাবেই ব্যক্তিত্বের ছাঁচ বদল হয়ে থাকে, ঊষারও হয়েছিল। মেয়েদের বেলাতেই বোধ হয় এমনতর মৌলিক পরিবর্তন বেশি সম্ভব।

এই উপন্যাসের আর একটি দিক উল্লেখনীয়, তা হলো প্রথাবদ্ধ বিবাহ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিয়ে মানেই কি নারীর পুরুষের আজীবন দাসীত্ব, সেবাদাসীত্ব কিম্বা ভোগদাসীত্ব? এর বিরুদ্ধে ঊষার সোচ্চার বিদ্রোহ - এই উপন্যাসটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। সনাতন বিবাহ অনুষ্ঠান রীতির বিরুদ্ধে নারীর এমন সবল ও সোচ্চার সমালোচনার প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে তেমন পড়েছি বলে মনে পড়ে না।"

**সমর গুপ্ত ঃ**

'গ্রামের মেয়ে' উপন্যাসের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সমর গুপ্ত। গ্রামের মেয়ে ঊষার জীবনের শুরুর দিকে সমর গুপ্তের অসামান্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের মাধ্যমে সকল বিপ্লবী মানুষদের মধ্যে সাম্যবাদের সচেতনতা ও সংগ্রামী চেতনা জাগিয়ে তুলেছেন সমর। ঊষার কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের অনুপ্রেরণা সমরের হাত ধরেই। কর্ম সঙ্গিনী হয়ে উঠতে গিয়ে ঊষার যে লড়াই তার নেপথ্যে সমরের অবদান থাকলেও প্রথম দিকে সমর ঊষাকে অনেকটা হেয় করেই দেখত। তাই জীবন সঙ্গিনী হিসেবে ঊষাকে গ্রহণ করার কথা কখনো ভাবতেই পারে নি সে। ঊষা কিন্তু মনে মনে সমরকেই তার জীবনসঙ্গী হিসেবে মেনে নিয়েছিল। কারণ তাদের ব্রতের মিল ছিল। অথচ যে সমরের হাত ধরে ঊষার উত্তরণ ঘটেছে সেই সমরই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। শেষে তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে ঊষার মনের বার্তা সমরের কাছে পৌঁচেছে। কিন্তু সমর নিজেকে হেয় ভেবেছে - নিজেকে ঊষার যোগ্য ভাবতে পারে নি, আর তাই শেষ পর্যন্ত ঊষার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে ঊষার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে পুনরায় কর্মের জগতে - বিপ্লবের পথে ফিরে এসেছে এবং উভয়ের মিলন ঘটেছে। উপন্যাসে বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সমর চরিত্রটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা যেতে পারে -

১) ঊষা, মনুষ্য জীবনটা দুর্লভ... পরকাল নেই.... বিজ্ঞান সভ্যতা মানুষকে এক মুক্ত

টিপ্পনী

পবিত্র শ্রমসুন্দর পৃথিবীর নন্দন কানন এনে দিয়েছে... যেখানে সমস্ত মানুষ সাম্যের, সত্যের সুন্দরের ন্যায়নীতিকেই অবলম্বন করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে নির্বাধ মুক্তির গতিতে।

২) দ্যাখ ঊষা, ভয়টা অন্যের দেওয়া জিনিস নয়, ভয়টা নিজেরই অন্তরের... আমরা চাই না আমাদের ভ্রান্ত সভ্যতার মুখোশ খুলে ফেলতে, তাই লোক নিন্দার কথা বড় হয়ে আসে।

৩) সাম্রাজ্যবাদ আর জমিদারী প্রথা আজ এক ষড়যন্ত্র সূত্রে গাঁথা... কাজেই কৃষক শ্রেণীকেও তার বন্ধু বেছে নিতে হবে। প্রথম বন্ধু হচ্ছে, পূর্বেই বলেছি মজুর শ্রেণী দ্বিতীয় বন্ধু হচ্ছে গণতান্ত্রিক দেশভক্তগণ.... এদের সাথে মিলিত হয়েই সাম্রাজ্যবাদ আর তার খুঁটি জমিদারী প্রথাকে কবর দিতে হবে।

টিপ্পনী

৪) ঊষা, ঊষা তুই আশ্চর্য - তুই মহামতী প্রতিভাশালী মেয়ে-।

৫) সেকি আজও এই বিভ্রান্ত জীবটির প্রতি শ্রদ্ধা বহন করিয়া চলে? কর্মহীন কমিউনিস্ট বিকৃত দৈত্য.... ইহা যে আমি নিজেই জানি।

৬) একদিন সে আমাকে শ্রদ্ধার অঞ্জলী দিত, তখন আমি এই বলিয়াই দুঃখ করিতাম, আমার সমপর্য্যায়ে সে নাই... আজ হয়ত সেও ভাবিবে... আমারই মতন ভাবিবে ইহাতে তাহার অন্যায় কিছু নাই।

৭) তুই আমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গলি ঊষা।

### হরনাথ নন্দী ঃ

ঊষার পিতা হরনাথ নন্দী। দরিদ্র হলেও বংশ মর্যাদায় কম নন। তারা শ্রীকর নন্দীর বংশধর। বংশ পরম্পরা ও পারিবারিক সম্মান সমাজের কাছে অটুট রাখতে বদ্ধপরিকর হরনাথ। অথচ গ্রামে ঊষার সমবয়সী অন্যান্য মেয়েদের যখন বিয়ে হয়ে গেছে, ঊষা তখন অবিবাহিতা। গ্রামের মানুষের সমালোচনা ও কটূ কথা সহ্য করতে হয় অনবরত। এমত অবস্থায় ঊষার মতো গ্রাম্য মেয়ের বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসা, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে দীক্ষিত হয়ে বাইরের পুরুষদের সঙ্গে বাড়িতে রাত্রি বেলা মিটিং করা হরনাথ মেনে নিতে পারেন নি। আর তাই ঊষার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে দেখা গেছে তাঁকে। কিন্তু ঊষার স্থির সিদ্ধান্ত ও যুক্তির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণও করতে হয়েছে। যদিও মন থেকে শেষপর্যন্ত মেনে নিতে পারেন নি। এই দুঃশ্চিন্তা ও মানসিক টানাপোড়েন নিয়ে রোগে ভুগে তাঁর মৃত্যু হয়। যে সমাজের কথা ভেবে তিনি ঊষার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতেন মৃত্যুর পর তাঁর শব দাহ করতে কিন্তু তারা কেউই এগিয়ে আসে নি। এক করুণ পরিণতি ঘটেছে তাঁর। হরনাথের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন স্নেহপরায়ণ ও মেয়ের মঙ্গল কামনাকারী এক পিতাকে আমরা দেখতে পাই, অন্যদিকে সামাজিক সংস্কারের কাছে অসহায় সমর্পণের মধ্য দিয়ে চিরাচরিত গ্রামীন মানুষকে দেখতে পাই। তাঁর বক্তব্যগুলো দেখে নেওয়া যেতে পারে -

১) মা'রে কেন বাঁচলাম...অর্থ কি....কিছুই যে ধরতে পারছি না।.... ব্যাথা বড় দুঃখ....।

২) কি করতে পারি? আমি যে নিজেকে কোন পদার্থের বলেই মনে করতে পারি না।

কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা.... আমার মন তুই জানবি না মা।

৩) একটা প্রাচীন বংশ..... নন্দী বংশ শুধু অভাবের তাড়নায় গুড়িয়ে যাবে, ধুলির সাথে মিশে যাবে...এর সম্ভ্রম মর্যাদা প্রতিষ্ঠা কিছুই অবশেষ থাকবে না মা। কালের প্রবাহে কি এও সম্ভব....।

৪) সংকীর্ণ পরিবার গন্ডী....হাত পা চড়াবার স্থান সঙ্কুলান হয় না....দেশ সেবা করব কি দিয়ে। একটা মেয়ের বিয়ে যে দিতে পারে না... তার আবার...।

টিপ্পনী

### ক্ষেমী পিসি ঃ

গ্রামের অনেক বাঙালি ঘরেই ক্ষেমী পিসির মতো চরিত্রকে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা গল্প উপন্যাসেও অনেক ক্ষেত্রেই পারিবারিক জীবনে ক্ষেমী পিসিদের মতো মানুষের কর্তৃত্বের চিত্রও দুর্লক্ষ নয়। ঊষার ক্ষেমী পিসি এগার বছর বয়সে বিধবা হয়ে পত্নীহীন ভাই হরনাথের সংসারের রাশ নিজের হাতে নিয়েছেন। কিন্তু মাতৃহীনা ঊষার প্রতি তাঁর আচরণ তেমন সংবেদনশীল নয়। বরং নিষ্ঠুর-ই বলা যায়। ঊষাকে অকারণ সন্দেহ করা ও গালাগাল দেওয়া ক্ষেমী পিসির নিত্যকর্ম ছিল। ঊষার বিপ্লবী দলের মানুষদের সঙ্গে ওঠা বসাও স্বাভাবিকভাবেই ক্ষেমী পিসি মেনে নিতে পারেন নি। হরনাথকে ঊষার বিয়ে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। নিজে সমাজের বঞ্চনার স্বীকার হয়েও সামাজিক অনুশাসন ও সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছেন। পাশাপাশি ঊষার স্বাধীন সত্তাকে সামাজিক অনুশাসনের গন্ডিতে বাঁধতে চেয়েছেন। শেষে ঊষার সঙ্গে বাক্‌বিতন্ডা করে হরনাথের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমরা এখানে ক্ষেমী পিসির বক্তব্যগুলো তুলে ধরে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝে নেবার চেষ্টা করব -

১) দেখ্ এত ভাল নয়, এত ভাল নয় বলছি....মানী পরিবার....না হয় সময়মত বিয়ে দিতে পারিনি.... চেষ্টা তো কম করেনি..... নিয়তি নির্বন্ধ না ঘটলে.... যাস্‌নে রাত্রিতে ওঘরে যাস্‌নে, তোর পায়ে পড়ি কথা রাখ্-।

২) না না ভাল মন্দের কথা নয়, সমাজে মুখ দেখানো যায় না ঠাকুর দা। নন্দী বাড়ীর একটা মান মর্যাদা ছিল। তোমার বংশে এমন অনাছিষ্টি কান্ড কোন কালে কেউ দেখে নি। মাঝখান থেকে লোকে আমারও অপবাদ শুরু করেছে-।

৩) একটা উড়ন চন্ডী-ছিনাল-গ্রামটা উচ্ছন্নে দেবে। ঘর পুড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে ওকে তাড়িয়ে দাও - নইলে বসন্ত কলেরায় গ্রাম ধ্বংস হবে, হবে, হবে-।

### গোবিন্দ ঃ

গোবিন্দ গ্রামের নিরীক্ষর হাল চাষা হলেও কমিউনিস্ট ভাবধারা সম্পর্কে সচেতন। যদিও সংসার ত্যাগ করে স্বদেশী করা বা বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে সে সমর্থন করতে পারে না। ঊষার পিতা হরনাথ যখন মৃত্যুশয্যায় তখন চৌদ্দ-পনের দিন গোবিন্দ এসে পাহারা দিয়েছে। ঊষাকে মানসিক বল জুগিয়েছে। হরনাথের মৃত্যুর পর তাঁর শবকে দাহ করারও ব্যবস্থা করেছে

গোবিন্দ। ক্ষুদ্র হাল চাষা হলেও তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষিত পরিণত মানুষের চিন্তারই প্রকাশ ঘটেছে –

১) প্রাণে সত্যিকার টান না থাকলে দেশকে ভালবাসব কি দিয়ে... ভালবাসা অমর... আমি একদিন এমনি কথা কয়ে বোকা হয়েছিলাম।

২) স্ত্রী পুত্রকে ভুলে কি আর স্বদেশী করা যায়, চাষীদের জন্য কৃষক শ্রেণীর জন্য সংগ্রাম করা চলে...?

টিপ্পনী

৩) ভূঁইয়ারা জমিদার, কৃষক প্রজা শোষণ করে কিন্তু তবুও ওদের মানুষ বলেই ভাবতাম – কিন্তু আজ এ বেশ বুঝতে পারছি – শোষকদের হৃদয় বলতে কিছু নেই। কিন্তু তোমরা হয়ত ভুলে যাবে দিঠাইন, আমি ভুলবো না–এর প্রতিশোধ আমায় নিতেই হবে।

৪) তা সকল মানুষই সমান – ওরা তোমার পিতাকে অপমান করেনি বরং নিজেদের গায়েই থু থু দিল – মরার উপরও শত্রুতা – তোমাদের এ সমাজের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

**সনাতন ঃ**

সমর গুপ্তর মতো যে সব বিপ্লবীদের নাম পুলিশের তালিকায় ছিল তাদের মধ্যে সনাতন একজন। ঊষার পিতার মৃত্যুর পর যখন পুরোপুরি বিপ্লবী, আন্দোলন, সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছে তখন সনাতন তাকে নানা ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে ও প্রেরণা জুগিয়েছে। সনাতন সমর গুপ্তকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। সে দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। তার নানা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী চেতনা ও দলের প্রতি একনিষ্ঠতার প্রকাশ ঘটে –

১) দিঠাইন খুনী আমরা নই, খুনী হবও না, কিন্তু দেশের জন্য, কৃষক সমাজের জন্য অনেক রক্ত দিতে হবে। রক্ত দানের ক্ষেত্রে শত্রুর রক্তও তো কিছু করবে?

২) বিদ্যার অর্থ কি? যে বিদ্যা মানুষকে গোলাম করে রাখে, মানুষকে শোষণ করে–জানোয়ারের মতো খাটায়, যে বিদ্যা যুগ যুগ বাংলাকে মূর্খ দরিদ্র নিপীড়িত করে রেখেছে ওই বিদ্যার সাথে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের মিল কোথায়?

৩) অভিশাপে বিশ্বাস নাই, তবুও দিয়াছে – নিপাত যাউক এই ভন্ড সভ্যতা। ইহারা মানুষকে এইটুকুও মনুষ্যত্ব দেয় নাই–দিয়াছে হৃদয়হীনতা–নিষ্ঠুরতা।

**সুরমা ঃ**

উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে অল্প সময়ের জন্য পেলেও ঊষা ও সমরের মিলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন যে চরিত্রটি তিনি হলেন সুরমা। ঊষা শহরে যার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সেই ডাক্তার রায়ের পত্নী হলেন সুরমা। একদিকে সমর গুপ্ত যখন বিপ্লবী কাজকর্ম থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, তখন অন্যদিকে সুরমা যাকে ঊষা মাসিমা সম্বোধন করতো তিনি ঊষার মনের খবর জেনে সমরকে পত্রের মাধ্যমে সব খবর জানিয়ে দুজনের মিলনের

যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছেন।এখানে সুরমার বক্তব্য উপস্থাপন করে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝে নেবার চেষ্টা করা যেতে পারে –

১) নারী একবার যাহাকে অন্তর দিয়া জীবনসাথী করিতে গ্রহণ করিয়া ফেলে তাহার জীবৎদ্দশায় অন্যকে গ্রহণ করিতে পারে না।

২) মানুষকে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় হতে হয়, সচেষ্ট হতে হয়। তোর দাবীতো একটুও অন্যায় নয়... এর জন্য সংগ্রাম করাও তোর কর্তব্য।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

# গ্রন্থপঞ্জি


**আকর গ্রন্থ ঃ**

১. চন্দন সেনগুপ্ত ঃ 'নাট্যসমগ্র', ত্রিপুরা দর্পণ, আগরতলা

২. জয়দীপ বিশ্বাস (সম্পা.) ঃ 'সুজিৎ চৌধুরী প্রবন্ধ একাদশ', বইমেলা, ২০১০, অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা।

৩. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ঃ 'পুরাণের পুনর্জন্ম ও অন্যান্য', সারস্বত লাইব্রেরি, কল-৬

৪. প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী ঃ 'গুণধরের অসুখ', জানুয়ারি, ২০১৪, বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ, গুয়াহাটি।

৫. প্রসূন বর্মন, প্রবুদ্ধসুন্দর কর ও অমিতাভ দেব চৌধুরী (সম্পা.) ঃ 'উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতা', মে, ২০১৫, ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি।

৬. বীরেন দত্ত ঃ 'নির্বাচিত রচনা', ডিসেম্বর, ১৯৯৩, গণ সাহিত্য প্রকাশন, আগরতলা।

৭. রমাপ্রসাদ দত্ত ও নির্মল দাশ (সম্পা.) ঃ 'শতাব্দীর ত্রিপুরা', অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা।

৮. হাসান আজিজুল হক (প্রধান সম্পা.) ঃ 'অসীমান্তিক', জানুয়ারি, ১৯৯৮, অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা।

**সহায়ক গ্রন্থ ঃ**

১. অমল পাল ঃ 'অশোকবিজয় রাহা', মে, ১৯৯৯, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা একাদেমি, কলকাতা।

২. অমিতাভ দেব চৌধুরী, তমোজিৎ সাহা (সম্পা.) ঃ 'শক্তিপদ ব্রহ্মচারী গদ্য সমগ্র', সেপ্টেম্বর, ২০১৩, সৈকত প্রকাশন, আগরতলা।

৩. অশোকবিজয় রাহা ঃ 'পত্রাষ্টক' ভারবি সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১০, ভারবি, কলকাতা।

৪. আরতি সিংহরায় (প্রকাশক) ঃ 'অশোকবিজয় রাহার শ্রেষ্ঠ কবিতা', জানুয়ারি, ২০০৯, ভারবি, কলকাতা।


টিপ্পনী

৫. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য ঃ 'শ্রীহট্ট-কাছাড়ের মনীষী-মনীষা ও অন্যান্য', বইমেলা, ২০০৯, অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা।

৬. ননীগোপাল দেবনাথ (সম্পা.) ঃ 'ঈশান বাংলার কবি ও কবিতা', ২০১১, অক্ষর পাবিলিকেশনস্, আগরতলা।

৭. বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য ঃ 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য', অক্টোবর, ২০০২, সাহিত্য প্রকাশনী, আসাম।

৮. মৈনাক বিশ্বাস (সম্পা.) ঃ 'উজান গাঙ বাইয়া হেমাঙ্গ বিশ্বাস', জানুয়ারি, ২০১২, অনুষ্টুপ কলকাতা।

৯. মৃণালকান্তি দেবনাথ ঃ 'দূর বাংলার কবিতা কয়েকটি প্রসঙ্গ', মে, ২০১৫, পারিজাত প্রকাশনী, ঢাকা।

১০. সুমন গুণ, বরুণজ্যোতি চৌধুরী ও রাহুল দাস (সম্পা.) ঃ 'আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ বৈচিত্র্য ও বিস্তার', বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১২, রত্নাবলী, কলকাতা।

১১. স্বপন সেনগুপ্ত ঃ 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা', ১৯৯৯, পৌণমী, আগরতলা।

## সহায়ক পত্র-পত্রিকা ঃ

১. অভীক সরকার (সম্পা.) ঃ 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১০ অক্টোবর, ২০০১, কলকাতা।

২. অশোক দাশগুপ্ত (সম্পা.) ঃ 'আজকাল', ১৫ অক্টোবর, ২০০১, কলকাতা।

৩. দীপক মিত্র, সিদ্ধার্থ সেন (সম্পা.) ঃ 'অন্যকথা', নবম বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৪, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

৪. নিলিপ পোদ্দার (সম্পা.) ঃ 'পুস্তক বার্তা', ৮ম আগরতলা পুস্তকমেলা, বিশেষ সংখ্যা, ২০১২, ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ড, আগরতলা।

৫. সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী ঃ 'রৈবতক', বর্ষ ২৫, নবপর্যায় সংখ্যা ৪, অক্টোবর, ২০১২, কলকাতা।